আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

Allah is Preparing us For Victory

শাইখ আনওয়ার আল আওলাকি (রহিমাহুল্লাহ)

আল্লাহ আমাদের বিজয়ের জন্য প্রস্তুত করছেন

যখন আল্লাহ কোন কিছু চান,তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ প্রস্তুত করে দেন।
উল্লেখিত এই মূলনীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে ইমাম ইবনে আসীর রহ. এর কালজয়ী ইতিহাস গ্রন্থ আল-কামিল থেকে। যার সারমর্ম হল,আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যদি কখনো কোনো অবস্থার সমাপ্তি চান তাহলে তিনি এমন পরিস্থিতি ও উপায় উপকরণ তৈরী করে দেন,যা সব কিছুকে সেই সমাপ্তির দিকেই পরিচালিত করে। তাই আল্লাহ তাআলা যদি এই উম্মাহর বিজয় চান তাহলে তিনি এমন পরিবেশ,পরিস্থিতি তৈরী করবেন,যা এই উম্মাহর বিজয়কে ত্বরান্বিত করবে। আর সেক্ষেত্রে আপনারা (যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সঠিক জ্ঞান দান করেছেন) বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি দেখেই বুঝতে পারবেন যে,আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম জাতির বিজয় এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বর্তমানে যা কিছু ঘটেছে,সেই ঘটনা প্রবাহ থেকে বিজয়ের আগাম বার্তা পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা যদি ধরে নেই যে,ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এর এই মূলনীতিটি সঠিক,তাহলে আমরা প্রমান করতে সক্ষম হবো যে,বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ইনশাআল্লাহ সময়ের ব্যাপার মাত্র।
বিজয়ের ব্যাপারে আমরা যদি কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত সাধারণ মূলনীতিগুলোর দিকে লক্ষ্য করি,তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তার কুরআনে এই উম্মাহর বিজয়ের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং তার রাসুল (সা.) ও এই উম্মাহকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন।
অতএব এটা আমাদের ঈমান ও আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি-এই উম্মাহই অবশেষে বিজয়ী হবে,তাতে তাদের বর্তমান অবস্থা যাই থাক না কেন। আর এ্ই উম্মাহর বিজয়ের ব্যাপারে আপনার মনে যদি কোনো সন্দেহ-সংশয় থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে,আপনার ঈমান-আক্বীদার নিশ্চয়ই

কোনো সমস্যা আছে। কেননা এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বিবৃত দলীলগুলো এতোই মজবুত ও সুস্পষ্ট যে,বিষয়টিকে উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য নিম্নে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু দলীল উপস্থাপন করছি। মহান আল্লাহ বলেন,
অর্থ: আর আমি পূর্ববতী উপদেশের (তাওরাত) পর যবূর কিতাবেও লিখে দিয়েছি যে,সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণই অবশেষে পৃথিবীর অধিকার ও কর্তৃত্ব লাভ করবে। (সূরা আম্বিয়া: আয়াত ১০৫)

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,
অর্থ:আমার বান্দা ও রাসূলগনের ব্যাপারে আমার এ সিদ্ধান্ত অনেক আগে থেকেই হয়ে আছে যে তাদেরকে নিশ্চয়ই (আমার পক্ষ থেকে) সাহায্য করা হবে এবং আমার বাহিনীই (সর্বশেষ) বিজয়ী হবে। (সূরা সাফফাত:আয়াত ১৭১-১৭৩)

এখানে আল্লাহ তাআলা নবী রাসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে,তিনি তাদেরকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,
অর্থ: নিশ্চয়ই এই পৃথিবী আল্লাহর,তিনি তাঁর বান্দাদের মাঝে যাকে খুশি কর্তৃত্ব দান করেন,তবে চূড়ান্তভাবে মুত্তাকীগণই এর কর্তৃত্ব লাভ করবে। (সূরা আরাফ: আয়াত ১২৮)
অর্থ্যাৎ আল্লাহ জমিনের কর্তৃত্ব সাময়িক সময়ের জন্য মুমিন বা কাফির যাকে খুশি দান করতে পারেন কিন্তু চূড়ান্ত ভালো পরিণতি কেবলমাত্র মুত্তাকী মুমিনদের জন্যই।
অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,
অর্থ: ওরা চায় ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে,কিন্তু আল্লাহ তা পূর্ণাঙ্গ করবেনই,কাফিরদের নিকট যতই তা ঘৃনা ও গাত্রদাহের কারণ হোক। (সূরা তাওবা: আয়াত ৩২)

আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে কাফিররা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য। তারা প্রাণপণ চেষ্ঠা চালাচ্ছে আল্লাহর আলো তথা তাঁর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা ইসলাম এবং মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাহ নির্বাপিত করতে। ইসলামের প্রচার,প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজকে বাঁধাগ্রস্থ করার জন্য এমন কোনো হীন পন্থা ও কাজ নেই যা তারা অবলম্বন করছে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে,এ কাজে তারা সর্বোতভাবে ব্যর্থ হবে।

তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার জন্য যে পরিমান অঢেল অর্থ খরচ করে,তা যে কাউকে বিস্মিত করে। ভেবে দেখুন ,আল্লাহ ওদের কত নিয়ামত দান করেছেন,ওদের হাতে কত সহায় সম্পদ রয়েছে,অথচ সবকিছু ওরা বিনিয়োগ করছে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য !

আমরা মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ লোকেরাই আজকাল শুধু অনুযোগ করে বলি,আমরা তাদের সাথে কীভাবে মোকাবেলা করবো? ওরা মিডিয়া নিয়ন্ত্রন করছে,পৃথিবীর তাবৎ বহুল প্রচারিত সংবাদপত্র ওদের মুখপাত্র,সকল ক্ষমতাধর রেডিও স্টেশন ওদের দখলে,পৃথিবীর প্রভাবশালী মিডিয়া ওদের কব্জায়,সরকার ও পুলিশ বাহিনী ওদের বশীভূত,এক কথায় গোটা বিশ্ব আজ তাদের করতলে। পৃথিবীর যাবতীয় কলকাঠি ওরাই নাড়ছে। ওদের হাতে যাবতীয় অর্থকড়ি,সহায় সম্বল। অতএব রণে ভেঙ্গে দেওয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই। তাই আমাদের উচিত সংগ্রামের পথ পরিহার করে বিকল্প কোন উপায়ে ওদের মোকাবেলা করা,সম্মুখ সমরে আমাদের যাওয়া উচিত নয় যেহেতু কোনভাবেই আমরা ওদের সমকক্ষ হতে পারবো না! বরং রাজনীতি ও কূটনীতির আশ্রয়ে ওদের মোকাবিলা করাই শ্রেয়।

অথচ আমরা যদি আল্লাহর কুরআন মনোযোগ দিয়ে পড়তাম,তাহলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারতাম যে,ইসলামকে প্রতিরোধের জন্য তাদের এই শত শত মিলিয়ন ডলার বাজেট দেখে আমাদের ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। কারণ স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা তাদের সম্পর্কে বলেছেন,

অর্থ: বস্তুত এখন ওরা আরও ব্যয় করবে। খানিকপর তাই ওদের জন্য আক্ষেপের কারন হবে এবং শেষ পর্যন্ত ওদের পরাজিত করা হবে। আর কাফিরদের জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (সূরা আনফাল: আয়াত ৩৬)

সুতরাং তাদের কাড়ি কাড়ি টাকা,শত শত মিলিয়ন খরচ করতে দিন। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,তারা প্রথমে তাদের অর্থবিত্ত ও সহায় সম্পদ খরচ করে নি:স্ব হবে,মনোক্ষুন্ন হবে,তারপর তাদের উপর পরাজয়ের গ্লানি নেমে আসবে। সুতরাং আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তাদেরকে তাদের সম্পদ খরচ করতে দেখে আমাদের বরং আরো খুশী হওয়া উচিত। কেননা,এর অর্থ হলো তাদের পরাজয় ঘনিয়ে আসছে এবং ইসলামের বিজয় অতি সন্নিকটে চলে আসছে।

তাদের অর্থনৈতিক রক্তক্ষরনের কথা এখন তারা নিজেরা গোপনও রাখতে পারছে না। এখন তারা নিজেরাই বলছে যে, আফগান ও ইরাক যুদ্ধ তাদের জন্য ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার যুদ্ধের চেয়েও বেশি ব্যয়বহুল হয়ে এক বিশাল অর্থনৈতিক বিপদ ডেকে এনেছে।
কোরিয়ার যুদ্ধে তাদের ব্যয় হয়েছিল ২০০ বিলিয়ন ডলার আর ভিয়েতনাম যুদ্ধে ব্যয় হয়েছে ৪০০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ইরাক যুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গেছে। আরো হচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতি ক্রমশ মুখ থুবড়ে পড়ছে। তাদের অর্থ খরচের বহর দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে যে আভ্যন্তরীন রক্তক্ষরনের কারনে অচিরেই তাদের অর্থনীতিতে ভয়াবহ ধস নামবে।আর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আল্লাহর আয়াতের বর্ণনার সাথে তাদের অবস্থা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। তারা এভাবে তাদের সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে খরচ করবে এবং তারপর তারা নিজেরাই আফসোস করবে। এটা তাদের হাতের কামাই। নিজেদের কৃতকর্মের পরিনাম। অতএব এর পরিনতি তাদের ভোগ করতেই হবে। কারণ ইরাক ও আফগান যুদ্ধে আসার জন্য কেউ তাদেরকে বাধ্য করেনি। বরং অন্যের পায়ে পারা দিয়ে ঝগড়া করার মতো তারা নিজেরা স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে। অতএব নিজেদের হাতে নিজেদের মৃত্যুকূপ খনন করার পরিনতি তারা শ্রীঘ্রই টের পাবে। কিন্তু তখন

তাদের কিছুই করার থাকবে না। আল্লাহর আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী তারা তাদের সম্পদ খরচ করবে,আফসোস করবে এবং তারপর তারা সদলবলে পরাজিত হবে। ১

আমেরিকার যুদ্ধাংদেহী মনোভাবের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তাদের আদর্শিক গুরু আবু জাহেলের ঘটনায়,যে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসে হাজির হয়েছিলো। অথচ তার যুদ্ধ করতে বদরের ময়দানে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না। মুসলিমরা যে বানিজ্য বহরকে তাড়া করেছিলো,তা নিরাপদ অবস্থানে চলে গিয়েছিলো। এমনকি বানিজ্য বহরের নেতৃত্বে থাকা আবূ সুফিয়ান তাকে দূত মারফত পত্র পাঠিয়ে জানিয়েছিলো যে,আপনারা মক্কায় ফিরে যান।আমি আমার বানিজ্য বহর রক্ষা করে নিরাপদ অবসস্থানে চলে এসেছি।

কিন্তু ঔদ্ধত,দুর্বিনীত আবূ জাহেল অহংকার প্রদর্শন করে বলেছিলো,না, আমরা অবশ্যই যাবো এবং তাদের মোকাবিলা করবো। আমরা বদরে যাবো,সেখানে তিনদিন থেকে আনন্দ ফূর্তি করবো,মদপান করবো,নর্তকীরা নেচে গেয়ে আমাদের মনোরঞ্জন করবে। আমি চাই গোটা আরববিশ্ব আমাদের যুদ্ধযাত্রার খরব শুনুক এবং জেনে নিক যে কুরায়েশদের আত্মসম্মানে আঘাত করা কিছুতেই বরদাশত করা হবে না। বদর ময়দানে তিনদিন অবস্থান করে গোটা আরবে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া হবে যে,কুরায়শদের দিকে কেউ হাত বাড়ালে তা কিছুতেই সহ্য করা হবে না। অতএব কেউ যেনো আর কোনোদিন কুর্াইশদের বিরুদ্ধে লড়ার দু:সাহস না দেখায়। (বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত হাদীস ও সীরাত গ্রন্থের বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

সেদিন আবূ জাহল যেরূপ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে বদরের ময়দানে এসেছিলো,যুদ্ধ বেছে নিয়েছিলো,ঠিক একইভাবে বর্তমানে আমেরিকাও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করছে এবং আবূ জাহেলের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের উপর কোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বরং তারা নিজেরাই এই যুদ্ধ বেছে নিয়েছে। আর এ যুদ্ধের পরিনতি ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। আর তাদের এই পরিনতি তো অবধারিত।

হযরত আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে কুদসীতে রাসুল সা. বলেন ,আল্লাহ বলেছেন,
অর্থ: যে কেউ আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষন করবে,আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। (সহীহ আল বুখারী: হাদীসে কুদসী অধ্যায়। সহীহ ইবনে হিব্বান,হাদীস নং ৩৪৭)
সুতরাং মনে রাখা দরকার যে মুসলিমরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করছেন! আমেরিকা গোটা বিশ্বের মালিক মহান আল্লাহ তাআলার সাথে স্পার্ধামূলক যুদ্ধে লিপ্ত!
আল্লাহ তাআলা বলেন,
অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছো তাদের সাথে মহান আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যে,তিনি তাদেরকে অবশ্যই আবারও খিলাফত দান করবেন,যেমনটি তিনি পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলেন।
তিনি তোমাদের জন্য তার পছন্দনীয় জীবন বিধানকে সুনিশ্চিত করে দিবেন এবং তোমাদের ভীতিকর পরিস্থিতিকে নিরাপত্তার দ্বারা বদলে দেবেন। (শর্ত হলো) তারা (জীবনের সকল ক্ষেত্রে) কেবল আমারই ইবাদত করবে,আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। তবে এরপরও যারা কুফরী করবে,তারা হলো ফাসিক। (সূরা নূর:আয়াত ৫৫)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে খিলাফত তাদেরকেই দেওয়া হবে যারা সত্যিকারের ঈমান আনয়ন পূর্বক আমালে সালিহ বা সৎকর্ম করবে।
বর্তমান সময়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ এক ভয়াবহ শংকা ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করছে। আর এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে,তিনি আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। তিনি এই উম্মতকে খিলাফত ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং এ দুনিয়াতে চূড়ান্তভাবে তার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে দেয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন।

রাসূল সা. এর বাণীতে উম্মাহর কাল পরিক্রমা ও খিলাফাহর প্রত্যাবর্তন:

একটি হাদীসে রয়েছে যে,হাদীসটিতে রাসূল সা. আমাদেরকে মুসলিম জাতির কাল পরিক্রমা কেমন হবে তার উপর বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত হাদীসটি সতর্কতা ও মনোযোগের সাথে পাঠ করা। হাদীসটিতে রাসূল সা. বলেন,
অর্থ: তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত থাকবে যতক্ষন আল্লাহ ইচ্ছা করেন,অত:পর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেয়ার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফত। তা তোমাদের মধ্যে থাকবে যতক্ষন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। অত:পর তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছে করবেন। তারপর আসবে বংশীয় শাসন ,তা থাকবে যতক্ষন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। অত:পর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর আসবে জুলুমের শাসন এবং তা তোমাদের উপর থাকবে যতক্ষন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন। অত:পর তিনি তা তুলে নিবেন যখন তা তুলে নেবার ইচ্ছা করবেন। তারপর ফিরে আসবে নবুওয়াতের আদলে খিলাফত। এরপর নবী সা. নীরব থাকলেন। (মুসনাদে আহমদ)

আলোচ্য হাদীসে যে নবুওয়াতের ধারার কথা বলা হয়েছে তা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সা. এর ইন্তেকালের সাথে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এরপর তিনি যে খোলাফায়ে রাশেদার কথা বলেছেন তা আরম্ভ হয়েছে হযরত আবূ বকর রা. এর মাধ্যমে আর তা সমাপ্ত হয়েছে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রা. এর খিলাফতের সমাপ্তির মধ্যে দিয়ে। এরপর তিনি বলেছেন,মুলকান যার অর্থ হলো রাজতান্ত্রিক শাসন। এর বাস্তবায়ন হয়ে গেছে বনু উমাইয়া,বনু আব্বাস ও উসমানী খিলাফতের মধ্যে দিয়ে।এরপর তিনি যে জুলুমতন্ত্রের কথা বলেছেন তা হলো আমাদের বর্তমান সমসাময়িক কাল। এটাই হলো স্বৈরাচারী জুলুমতন্ত্র। এরপর আবার আসবে খিলাফতে রাশেদা। এভাবে পৃথিবীর সমাপ্তি ঘটবে,রাসুল যেহেতু শেষে মৌনতা অবলম্বন করেন,তা থেকেই এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

বর্তমান অবস্থার ব্যাপারে অভিযোগ না করা:

কখনও আমারা সময়ের বা কালের অভিযোগ করে থাকি। (নিজের দায়িত্ব এড়ানোকে বৈধতা দেয়ার জন্য) আমরা বলে থাকি,আমরা সবচেয়ে খারাপ সময়ে বসবাস করছি,মুসলিম উম্মাহ আজ মারাত্মক দূর্বল,অসহায়,পরাজিত,বিচ্ছিন্ন,বিভক্ত। আহ! আমরা যদি সাহাবায়ে কেরামের যুগে জন্ম নিতাম ! কিংবা ইসলামের স্বর্ণালী যুগে থাকতাম! তাহলে কতইনা ভালো হতো। কত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাই না আমরা পালন করতে পারতাম। এমন অভিযোগ করা আমাদের মোটেই শোভনীয় নয়,কিছু যৌক্তিক কারন নিচে তুলে ধরা হলো,

প্রথম কারন:
জনৈক তাবেঈ একজন সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করেন,রাসূল সা. যখন আপনাদের মাঝে ছিলেন, তাঁর সাথে আপনারা কী রূপ আচরণ করতেন? কিভাবে তার সমাদর করতেন?
উত্তরে সাহাবী বললেন যে কিভাবে তারা রাসুলের সমাদরের ব্যাপারে তাদের সামর্থের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করতেন।
সাহাবীর কথা শুনে তাবেঈ বললেন,রাসূল সা. আমাদের জীবদ্দশায় পেলে তাঁকে কাঁধে তুলে রাখতাম।

এখানে আমরা তাবেঈর কথা একটু বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারবো। তিনি যেনো বলতে চাচ্ছেন যে,সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর রাসূর সা. কে যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেননি। এবং আল্লাহর রাসূল সা. তাদের সময়ে যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তারা সাহাবীদের চেয়েও আল্লাহর রাসূর সা. কে আরো বেশি সমাদর ও মর্যাদা দিতে পারতেন।

তার কথার উত্তরে সাহাবী বললেন,সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর রাসূল সা. কে কেমন মর্যাদা দিতেন,কেমন ভালবাসতেন,তাঁরা দীনের জন্য কেমন আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন তা এমন কোনো ব্যাক্তির পক্ষে যথাযথভাবে বোঝা সম্ভব নয় যে সেই সময় উপস্থিত ছিলো না। তিনি আরো বললেন,কেউ জানে না,সে সময় জীবিত থাকলে সে কী করতো,আমাদেরকে নিজেদের জন্মদাতা পিতা ও আপন ভাইদের বিপক্ষে যুদ্ধ

করতে হয়েছে,যা কখনই সহজ কোন ব্যাপার ছিল না। এর এখন তোমাদের পিতা,মাতা,ভাই,পরিবার,পরিজন সবাই মুসলিম। আর তুমি কেবল ধারনা করছো যে আল্লাহর রাসূল সা. তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকলে তোমরা তাঁকে আরো বেশি মর্যাদা দিতে। শোনো এমন কোনো কিছু (সম্মান বা দায়িত্ব) কামনা করো না,যা আল্লাহ তোমাদের জন্য বরাদ্ধ করেন নি।

দ্বিতীয় কারণ:
আমাদের বর্তমান সময় নিয়ে অভিযোগ করা উচিত নয়। বরং আমাদেরকে যে আল্লাহ তাআলা এই সময়ে পাঠিয়েছেন সেজন্য আমাদের উচিত আল্লাহর প্রতি আরো বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া। কেনো আমাদের আরো বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত? আসুন ভেবে দেখি!

আমরা জানি গোটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে সাহাবীগণের মর্যাদা হলো সবার উপরে। নবীদের পরে মানুষের পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ আসনে তাঁরা অধিষ্ঠিত। তাদের পরে রয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবেঈগণ এবং রয়েছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাবে তাবেঈনগণ।
সাহাবায়ে কিরামের মর্যাদা এতো বেশি হওয়ার অন্যতম কারন হলো তাঁরাই সুমহান ইসলামের ভিত্তিমূল রচনা করেছেন। ইসলাম নামক প্রসাদটিকে শূণ্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তাঁদের জান ও মালের কুরবানীর উপরই নির্মিত হয়েছে ইসলামের প্রসাদ। তাঁরা যখন কাজ করেছেন তখন ইসলামের কিছুই প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁরা এই দ্বীনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তাঁদের পর যারাই এসেছেন তাদের সবার সামনে দ্বীনের প্রসাদ নির্মিতই ছিল,তারা হয়তো এই ভিত্তির সাথে এখানে ওখানে এক দুটো উপাদান যোগ করেছেন অথবা কালের আবর্তনে দ্বীনের আসল প্রসাদের গায়ে বিদআত নামক আগাছা,পরগাছা গজালে বা শেওলা ধরলে তা হয়তো কেটে কুটে ,ঝেড়ে মুছে পরিস্কার করেছেন।কিন্তু দ্বীনের মূল প্রসাদ তো সাহাবায়ে কিরামদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। অতএব সংস্কারক বা সৌন্দর্য বর্ধনকারী তো নিশ্চয়ই মূল প্রসাদ নির্মানকারীর সমান মর্যাদা পেতে পারে না।

মূল কথা হলো,সাহাবায়ে কিরাম রা. এর সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির কারণ হলো তাঁদের কাজটি ছিলো সবচেয়ে বেশি কঠিন কাজ এবং তাঁরা সেটি আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তাঁ;দর পক্ষে সম্ভব সর্বোচ্চ কুরবানী করেছেন।

পরিস্থিতির ব্যাপারে অভিযোগ না করে আমারা যদি সত্যিই কিছু করতে চাই তাহলে আমাদের উচিত সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করা। সময়ের দাবী উপলব্ধি করে আমাদের দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করা।
কারন উম্মাহর পরিস্থিতি অনুযায়ী একেক সময়ে একেক ধরনের কাজ সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারনেই দেখা যায় যে, তাবেঈগণ হয়তো গুরাত্বরোপ করেছেন এক বিষয়ের উপর তো তাবে তাবেঈগণ করেছেন অন্য এক বিষয়ের উপর। বিষয়টি আরো ভালো করে বোঝার জন্য আমরা কিছু উপমার দিকে লক্ষ্য করতে পারি।

ইমাম বুখারী রহ.
ইমাম বুখারী রহ. যদি একশ বছর পর এসে হাদীস সংকলনের সেই একই কাজ করতেন,তাহলে নিশ্চয়ই উম্মাহর মাঝে তাঁর সেই অবস্থান ও মর্যাদা তৈরী হতো না যে মর্যাদা উম্মতের মাঝে এখন তাঁর রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী বা ইমাম আবূ হানিফা রহ. এর আবির্ভাব যদি আরো এক শতাব্দী পর হতো এবং তাঁরা যদি ফিকহী বিষয়ে গবেষনার সেই একই কাজ করতেন তাহলেও আমাদের মাঝে বর্তমানে তাঁদের যে স্বতন্ত্র মর্যাদা রয়েছে তা কিন্তু থাকতো না। কারন তাদের প্রত্যেকের সমকালীন পয়োজন ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। আর এভাবে সময়ের ব্যবধানের কারনে যুগে যুগে প্রয়োজনের ভিন্নতা তৈরী হওয়াটাই স্বাভাবিক।
আরেকটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন যে,ফিকাহ শাস্ত্রের চারজন ইমামেরই আবির্ভাব হয়েছে একই শতাব্দীতে এবং হাদীস শাস্ত্রের ছয়জন ইমাম তথা ছিহাহ ছিত্তার ছয়জন সংকলকের আবির্ভাবও একই শতাব্দীর মধ্যে। এ থেকে বোঝা যায় যে,একটা সময় উম্মতের প্রয়োজন ছিলো,ফিকহী মাসআলা মাসায়েলের উপর গবেষনা তো আরেকটি যুগের প্রয়োজন ছিলো আল্লাহর রাসুলে হাদীসসমুহকে যাচাই বাছাই করে সংকলন ও সংরক্ষনের।

এ বিষয়ের উপর আমার এত কথা বলার কারন হলো ,আমরা অনেক সময় আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বিজয়ের জন্য কাজ করতে চাই কিন্তু ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ তাআলা কোন কাজটা করতে বলেছেন,কিভাবে করতে বলেছেন,তা সঠিকভাবে জানা না থাকার কারনে আমরা আমাদের অর্থ ,সময়,মেধা,শ্রম,এমন কাজে ব্যয় করি,যা বাস্তব অর্থে দ্বীনের কোন কাজেই আসে না। তাই আমরা যদি সত্যিই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য কাজ করতে চাই,তাহলে আমাদেরকে আগে জানতে হবে,বর্তমান সময়ের জন্য কোন কাজটি সবচেয়ে বেশি জরুরী এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোন কাজ করতে বলেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আল্লাহর নির্দেশিত সেই কাজ কিভাবে সর্বোত্তম পন্থায় আঞ্জাম দেয়া যাবে।

আমরা দেখতে পাই যে,আমাদের কতিপয় দ্বীনি ভাই শুধু দাওয়াতী কাজের উপর গুরুত্বারোপ করেন। আবার অন্য কিছু ভাইয়েরা রয়েছেন,যারা শুধু ইলম অর্জনের পথে লেগে াকতে বলেন। আমরা স্বীকার করি যে,দাওয়াতের কাজ করা এবং ইলম অর্জন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং শুধু এ দুটো কাজ নয়,বরং ইসলাম আমাদের যত কাজের আদেশ দিয়েছেন স্ব স্ব সানে তার প্রত্যেকটিরই গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু আমরা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করি যে বর্তমানে সময়ে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের বর্তমান সময়টির সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে সাহাবায়ে কিরামদের সাথে। কারন বিগত চৌদ্দশ বছরে আমরা জাহেলিয়াতের সর্বনিম্ন স্তরে পৌছে গেছি। বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অধ:পতন এতো প্রান্তসীমায় এসে পৌছেছে যা বিগত চৌদ্দশত বছরের ইতিহাসে আর হয়নি।

আমরা যদিও আমাদের বতমান পরিস্থিতির ব্যাপারে শুধু অভিযোগ করি আর আমাদের অবস্থা যদিও আক্ষরিক অর্থে হুবহু সাহাবা”য় কেরামের মতো নয় ,তথাপি ও সার্বিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে,এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে সাহাবায়ে কিরামদের সময়ের সাথে। এই বক্তব্যের সমর্থনে যে বিষয়গুলো তুলে ধরা যেতে পারে তা হলো:

ক. (মাক্কী জীবনে) সাহাবায়ে কেরামগণ যখন ইসলামের পথে এসেছেন তখন সমাজে মুসলমানদের কোন কর্তৃত্ব,নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল না। ইসলামি হুকুমতও ছিল না। আর বর্তমানের অবস্থাও অনুরূপ। অথচ মুসলমানদের এমন কর্তৃত্ব,নের্তৃত্ব ও ইসলামিক রাষ্ট্রবিহীন এমন দূরাবস্থা (১৯২৪ সনের পূর্বে) ১৪ শত বছরের ইতিহাসে আর কখনো হয়নি।

খ. সাহাবায়ে কিরামদের যেমন তাদের সময়ে তাদেরকে বেষ্টন করে রাখা গোটা আরব উপদ্বীপ,ততকালীন দুই শক্তিশালী পরাশক্তি রোমান ও পারস্য সম্রাজ্যসহ বহুবিধ শক্তির মোকাবেলা করতে হয়েছে। বর্তমান সময়েও একই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঘরের শত্রু,বাইরের শত্রু সবাই মিলে আজ ইসলামের বিজয়কে রোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোমর বেঁধে লেগেছে। এমন নাজুক পরিস্তিতি (১৯২৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত) আমাদের অতীত ইতিহাসে আর কখনো আসেনি। ভালো হোক মন্দ হোক মুসলমানদের কোন না কোন নের্তৃত্ব,কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। সত্যেকে সাহায্য করার মত একদল লোক সব সময়ই সমাজে পাওয়া যেত। অন্তত:পক্ষে খারাপ পরিস্থিতি থেকে নিজের দ্বীন ঈমানকে হেফাজত করার জন্য হিজরত করে যাওয়ার মতো কোন না কোন স্থান পাওয়া যেত। বর্তমান সময়ে গোটা বিশ্ব ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে আর এই পরিস্থিতির মিল একমাত্র সাহাবায়ে কিরামদের পরিস্থিতির সাথেই পাওয়া যায়। আর এজন্য খুব স্বাভাবিক যে,এই কঠিন পরিস্থিতিতে যারা কাজ করবে তাদের পতিদানও বহুগুন বেশি হবে। তাদেরকে নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ সুবনাহু তাআলা অনেক বেশি পরিমান আজর বা বিনিময় দান করবেন এবং তাদের মর্যাদা অনেক উচু স্তরে তুলে দিবেন।আমরা একথা বলছি না যে এদের বিনিময় সাহাবায়ে কিরামের সমান হবে,তবে এটা বলছি যে এদের বিনিময় অনেক উচু দরজার হবে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে,আমাদের আকীদা হলো,মর্যাদার দিক থেকে এই উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম হলেন সাহাবায়ে কিরামগণ,তারপর তাবেঈন,তারপর তাবে তাবেঈন। কিন্তু আমরা রাসূল সা. এর সেই হাদীসটিকেও মনে রাখতে চাই,যে হাদীসে তিনি বলেছেন,

অর্থ: তোমাদের পর এমন একটি যুগ আসবে যখন ধৈর্য ধরে দ্বীনের উপর কেবল টিকে থাকাটাই হতে আগুনের অঙ্গার নিয়ে থাকার মতো কঠিন হবে। সে সময়ে যারা (আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য) কাজ করবে তাদেরকে পঞ্চাশ জনের সমপরিমান বিনিময় দান করা হবে।জিজ্ঞাসা করা হলো,ইয়া রাসুলুল্লাহ সমসাময়িক পঞ্চাশ জনের সমপরিমান বিনিময় নাকি আমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমান বিনিময়? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,তোমাদের পঞ্চাশ জনের সমপরিমান। (তিরমিযী: হাদীস নং ৩১৫৫)

অতএব তাদের সালাত হবে পঞ্চাশ জন সাহাবীর সালাতের সমান। তাদের সিয়াম হবে পঞ্চাশ জন সাহাবীর সিয়ামের সমপরিমান। কেনো এতো বেশি বিনিময় দেয়া হবে? কারন সে সময়টি হবে ভীষন সঙ্কটময়। এ সময়টি হবে অত্যন্ত জটিল এবং কঠিন্। এই কঠিন পরিস্থিতে সঠিক ঈমান ও সঠিক আমলের উপর থাকার কারনেই তাদের বিনিময় এতো বেশি দেয়া হবে।
আমরা দেখতে পাই,রাসুল সা. তার উম্মতের শেষ জামানায় এমন কিছু সৌভাগ্যবান মানুষের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা হবে তার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত। যেমন রাসুল সা. বলেন
অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,রাসুল সা. বলেছেন,(দক্ষিণ ইয়েমেনের) আদনে আবইয়ান অঞ্চল থেকে বারো হাজারের একটি বাহিনীর আবির্ভাব হবে,তারা আল্লাহ ও তার রাসুল সা. কে সাহায্য করবে এবং আমার ও তাদের সময়ের মধ্যে তারাই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসনাদে আহমাদ,মুজামুল কাবীর,তারীখুল কাবীর)

লক্ষ্য করুন,আল্লাহর রাসূল সা. কি বলেছেন! তিনি বলেছেন যে তারা আল্লাহর রাসূল ও তাদের সময়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। সুতরাং আমরা ধরে নিতে পারি যে,তারা আল্লাহর রাসূলের পর থেকে যতো যুগ ,যতো শতাব্দী পরে হবে,তার মধ্যে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ। বিগত শতকসমূহের মাঝে তারাই উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারন কি? কারন হলো তাদের সময়টি সাহাবায়ে কিরামদের সময়ের মতো

জটিল ও কঠিন হবে।তাদেরকেও সেই একই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে,যা সাহাবায়ে কিরামদের করতে হয়েছিল।
সুতরাং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এই স্বর্ণালী সময় হাতে পেয়েও কেনো এতো অকারণ অভিযোগ?

জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে অনেক সময় অর্থনীতির এমন (বুম) স্ফিতি তৈরী হয়। যারা সে সময় একটু বুদ্ধি করে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে,যারা একটু রিস্ক নেয়ার সাহস দেখাতে পারে,তারা হটাত করে আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার মতো বিরাট বিত্তশালী ধনী হয়ে যায়।আবার যখন অর্থনীতিতে স্থবিরতা নেমে আসে,বাজারে মন্দা সৃষ্টি হয় তখন অনেক আফসোস করতে থাকে যে আহ!
ঐ সময়ে আমি একটু বুঝতে পারতাম,যদি একটু রিস্ক নিতাম,যদি সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে পারতাম,তাহলে আমিও তাদের মতো মিলিয়নার ,বিলিয়নার হয়ে যেতাম। তখন মানুষ পরিতাপের সাথে ভাবে ও আশা করে,সুদিন ফিরে পেলে তারাও পূর্বসূরীগনের ন্যায় স্বচ্ছল হতে পারত।

হাসানাত ও আজর অর্জনের পরিমান বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিস্থিতির সাথে। পরিস্থিতি যতো জটিল কঠিন হবে আজর ততো বেশি হবে। অতএব কেন এই সময় ও পরিস্থিতির ব্যাপারে অকারনে অভিযোগ? এটা তো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের সবচেয়ে উত্তম সময়।
আমরা যেখানে এমন একটি সময়ের কথা বলছি,যখন বিজয় একান্ত নিকটবর্তী। আল্লাহর রাসূল সা. এর করে যাওয়া ভবিষ্যত বাণী বাস্তবে প্রত্যক্ষ করছি-যারা ইমাম মাহদীকে বিজয়ী করবেন,যারা ঈসা আ. কে বিজয়ী করবেন। আমরা মনে করি যে,আমরা বহুল প্রতিক্ষিত ,বহুল আঙ্কক্ষিত সেই সিদ্ধান্তকর সময় অতিক্রম করছি,আর তারপরও যদি আমরা বাস্তব ময়দানে কাজে অংশগ্রহন না করি,যদি আমরা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করি,তাহলে আমাদের পরিনতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অতএব জান্নাত ক্রয়ের এই স্বর্ণালী মুহূর্তে কিছুতেই আমাদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা উচিত নয় যখন অন্যরা জান্নাতের অনেক উচু মাকামগুলোতে

নিজেদের জন্য বুকিং দিয়ে ফেলছে। আমাদের উচিত নয় শুধু অভিযোগ করে নিরব দর্শকেরর ভূমিকা পালন করা।

হযরত সাওবান রা. থেকে বর্ণিত,রাসূল সা. বলেন,
অর্থ: আল্লাহ আমার সামনে সমগ্র পৃথিবী তুলে ধরলেন,আমি এর পূর্ব হতে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত অবলোকন করেছি। (তোমরা শুনে রাখো) নিশ্চিতভাবে আমার উম্মতের কর্তৃত্ব ততো দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে,যতো দূর পর্যন্ত আমার সামনে তুলে ধরা হয়েছে।(সহীহ মুসলিম,হাদীস নং ২৮৮৯। মুসনাদে আহমাদ ,হাদীস নং ২২২৯৪)

অতএব আমাদের বর্তমান অবস্থা যতো দূর্বলই হোক না কেন,সেদিন ইনশাআল্লাহ বেশি দূরে নয়,যেদিন এই ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিটি নগর,মহানগর,দেশ মহাদেশের উপর এর প্রভাব বিস্তার করবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পতাকা প্রতিটি নগর মহা নগরীতে স্বমহিমায় পতপত করে উড়বে। পৃথিবীর এমন প্রতি ইঞ্চি জায়গার উপর আল্লাহর এই দ্বীন বিজয় লাভ করবে,যেখানে দিন রাতের আলো আধারে পৌছে।

এমন স্থান কি পৃথিবীর কোথাও আছে,যেখানে দিনের আলো পৌছায় না? সুতরাং হে কাফির,মুনাফিকগণ!
তোমরা যদি এই দ্বীনের আলো থেকে নিজেদের লুকাতে চাও,তাহলে তোমাদেরকে এই পৃথিবীর বুক ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে। সেই দিন আর বেশি দূরে নয়,যেদিন এই দুনিয়াতে তোমাদের জন্য এক ইঞ্চি জায়গাও থাকবে না,যেখানে গিয়ে তোমরা আত্মগোপন করবে।

বিজয় অতি নিকটে

আমরা দাবি করছি যে মুসলিম উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে। আসুন আমরা এখন আমাদের দাবীটি নিয়ে একটু পর্যালোচনা করি। আমরা আমাদের এই দাবীকে

প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ইতিপূর্বে উল্লেখিত মূলনীতিকে ব্যবহার করবো। আর সেই মূলনীতিটি ছিলো,
অর্থ: যখন আল্লাহ কোন কিছু চান,তখন তিনিই তার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় উপকরন প্রস্তুত করে দেন।

প্রথমে আসুন আমরা এই মূলনীতিটি সঠিক কি না, তা ভালো করে বুঝে নেই। এই মূলনীতিটি যে একটি অকাট্য সত্য মূলনীতি তা বোঝার জন্য আমরা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে তাকবো। নিম্নে আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কতগুলো ঘটনা উদাহরন হিসাবে উল্লেখ করছি,আর এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ আমাদের এই মূলনীতিটার বাস্তবতা নিশ্চিতভাবে প্রমানিত হবে।

প্রথম উদাহরন:
সহীহ বুখারীতে হযরত আয়েশা রা. হতে বর্নিত একটি হাদীসে আছে যাতে বলা হয়েছে যে,রাসূল সা. মক্কায় দীর্ঘ তের বছর দাওয়াত দেন। সেখানে আশানুরুপ ফল না পেয়ে তিনি তায়েফে গমন করেনত,কিন্তু সেখানেও তিনি বৈরী পরিস্থিতির শিকার হন।

তিনি প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের কাছে দাওয়াত দিতেন,বিভিন্ন গোত্রের সামনে নিজেকে (নিজের নবুওয়াতকে) উপস্থাপন করতেন। এবং প্রত্যেক গোত্রের কাছে একটা বিশেষ সাহায্য চাইতেন। তিনি বলতেন,তোমরা আমাকে নুসরাহ দাও,যাতে আমি আমার রবের বাণী সবার কাছে পৌছে দিতে পারি। কিন্তু তারা তাকে প্রত্যাখান করতো। কেউই তার কথায় পুরোপুরি সম্মত হতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা চাচ্ছিলেন,এই মহান কাজের সুবর্ণ সুযোগ অন্য কাউকে দিয়ে তাদেরকে ধন্য করতে। আর তারা হলো মদীনার আওস ও খাজরাজ গোত্র। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিভাবে করেছিলেন?

আওস এবং খাযরাজ গোত্রদ্বয় দীর্ঘদিন যাবত একে অন্যের বিরুদ্ধে এক চরম রক্তক্ষয়ী অন্তহীন দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তারা প্রতিদিন জেগে উঠে যুদ্ধ করত। এ রকমই ছিল তাদের জীবন। যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত ,শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো। হ্যাঁ,এটাই স্বাভাবিক যে যতো বড় যোদ্ধা ও বীর পুরুষই হোক না কেন,যদি সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়,তবে তখন আর যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না। এভাবেই এই যুদ্ধ এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌছেছিলো,যা তাদের পক্ষে আর চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। শেষ মেষ তারা রণে ভঙ্গ দিল। এই অবস্থায় তাদের সামনে এলো ইয়াওমুল বুয়াস।

হযরত আয়শা রা. এ প্রসঙ্গে বলেন,এই বুয়াসের দিনটি ছিল এমন একটি সময় যা আল্লাহ তাআলা তার রাসূল সা. এর জন্য একটি বিশেষ উপহার হিসাবে প্রদান করেছিলেন।
অথচ বুয়াসের সাথে আল্লাহর রাসুল সা. এর প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। এটা ছিল একান্তই মদীনার লোকদের আভ্যন্তরীন ব্যাপার। আর সে সময়ে মদীনার সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এই বুয়াস যুদ্ধে আওস ও খাজরাজ এক অপরের উপর নির্মমভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং শুধু সাধারন মানুষই নয় বরং তাদের উভয় পক্ষের নেতৃস্থানীয় লোকদের প্রায় সবাই নিহত হন। যার কারনে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই নেতৃত্ব শূণ্য হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় সারির যেসব নেতারা বেঁচে ছিলেন তারাও কোনো না কোনভাবে আহত ছিলেন।

আপনি যদি একটু মনোযোগ সহকারে কুরআনে বর্নিত নবীদের ইতিহাস পড়ে াকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে যুগে যুগে আল্লাহর নবীদের বিরোধিতায় যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে তারা সকলেই প্রায় একটি বিশেষ শ্রেণীর হযে াকে। কুরআনে তাদেরকে মালা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আর মালা বলা হয় সমাজের নেতৃস্থানীয়,প্রভাবশালী লোকদেরকে। হতে পারে সে নেতৃত্ব রাজনৈতিক ,হতে পারে অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক।এই নেতৃস্থানীয় লোকেরাই যুগে যুগে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আল্লাহর নবীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলো।

এর কারন হলো তারা জানে যে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদের ক্বায়েমী স্বার্থই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তারা জানে যে,তারা যে শোষনের সমাজ কায়েম করে রেখেছে,ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে তা ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেখানে কায়েম করবে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ। তারা জানে যে নবীদের আগমনই হলো নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তাদের হাত থোকে ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহ তআলার হাতে অর্পন করার জন্য। যার কারনে তারা সমাজে তাদের যে একটি বিশেষ মর্যাদা বা স্ট্যটাস কায়েম করে রেখেছে তা আর াকবে না। ইসলামের সমাজে সকল মানুষ এক আল্লাহর বান্দা বা গোলাম হিসাবে সমান মর্যাদা লাভ করবে এবং সমাজে খিলাফাহ কায়েম করা হবে শুধু আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য।কোন ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীর মনগড়া বিধানের কোন স্থান এই সমাজে থাকবে না বরং মানবরচিত আইনের নোংড়া জঞ্জালকে সেই সমাজ থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করা হবে।

এ কারনেই আমরা দেখতে পাই,আবু বকর রা. উমর রা. তাদের কাউকেই তাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। বরং তাদেরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিলো কেবল আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের জন্য। একটি পরিপূর্ন ইসলামী সমাজে কেউ কখনো নেতৃত্ব কর্তৃত্বের লোভী হয় না। কারন তারা সবাই জানে যে নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এমন এক বোঝা যা বহন না করাই ভালো। যার দায়িত্ব যতো বেশি থাকবে ,তাকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর বিচারের দরবারে ততো বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। যার কারনে একজন সঠিক ঈমানদার কখনো আগ বাড়িয়ে দায়িত্বের বোঝা নিজের কাধে তুলতে চায় না॥ তাই তো আমরা দেখাতে পাই যে খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রত্যেককে খিলাফতের দায়িত্ব জোর করে দেয়া হয়েছিলো। তারা কেউই এই দায়িত্ব নেয়ার জন্য লালায়িত ছিলেন না। আবূ বকর রা. চাচ্ছিলেন উমর রা. কে বাইয়াত দিতে। কিন্তু উমর রা. জোর করে আবূ বকর রা. কে বাইয়াত নিতে বাধ্য করেন।

আবূ বকর রা. ইন্তেকালের সময় জোর করে উমর রা. এর উপর খিলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করে যান। উমরা রা. যখন মুমূর্ষ অবস্থায় তখন লোকেরা তার পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কে খিলাফতের দায়িত্ব দিতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন,আমি চাই

না কিয়ামতের দিন আমার পরিবার থেকে দুইজন এতো বড় বোঝা কাঁধে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হোক।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে,যুগে যুগে ফিরআউন,ক্বারুণ,আবূ জাহেল ও আবূ লাহাবের মতো নেতৃস্থানীয় লোকেরাই ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলো। এরাই হলো সেই সমস্ত লোক যারা নেতৃত্বের অপব্যবহার করে অর্থবিত্ত,পদমর্যাদা,খ্যাতি ইত্যাদির অধিকারী হয়ে দম্ভ দেখিয়ে বেড়ায়। এরাই তাদের সামাজিক অবস্থান ধরে রাখার জন্য ইসলামের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান হারানোর ভয় তাদেরকে সারাক্ষন তাড়িয়ে বেড়ায়।

তবে হ্যাঁ,লোকেরা যদিও তাদেরকে অনেক ক্ষমতাশালীক ও মুক্ত স্বাধীন মনে করে,কিন্তু বাস্তব অর্থে তারা কিন্তু মোটেও মুক্ত স্বাধীন নয়। তারা মানুষের গোলাম। তারা লোভের গোলাম। তারা খ্যাতির গোলাম। তারা বিত্তের গোলাম। সর্বোপরি তারা কু-প্রবৃত্তির গোলাম্। কারন মানবরচিত মুল্যবোধ ও বিধি ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করে কোনো মানুষ কখনো সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারে না,সে অসংখ্য প্রভুর গোলামীর জিঞ্জিরে বন্দি হয়ে থাকে।

একারহেন আমরা দেখতে পাই রাবিয়া ইবনে আমির রা. পারস্য সম্রাজ্য আক্রমনের জন্য গিয়েছিলেন তখন পারস্য সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,তোমরা কেন আমাদের দেশ আক্রমন করতে এসেছো? তোমরা যদি অর্থে বৃত্তের জন্য আক্রমন করে াকো,তাহলে বলো,আমরা তোমাদের প্রত্যেককে পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ দিবো,তারপরও তোমরা চলে যাও। রাবিয়া ইবনে আমীর রা. বলেন,আমরা এখানে অর্থ বিত্তের জন্য আসিনি। আমরা এসেছি মানুষকে মানুষের গোলামি থেকে মুক্ত করে আল্লাহর গোলামীর বন্ধনে আবদ্ধ করতে।ধর্মের নামে প্রচলিত অন্যায় অবিচারের হাত থেকে মুক্ত করে ইসলামের ন্যায় ইনসাফ কায়েম করতে। দুনিয়ার সংকীর্ন মানসিকতা থেকে মুক্ত করে মানুষকে আখিরাতের দিগন্ত বিস্তৃত বিশালতার জগতে পর্দাপন করাতে। ধর্মের নামে যে জুলুমের বেড়াজাল তৈরী হয়েছে তা ছিন্ন করে ইসলামের ন্যায় বিচার

প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের প্রেরণ করা হয়েছে।আমরা মানুষকে এই দুনিয়ার সংকীর্নতা থেকে বের করে এই পৃথিবী ও আখিরাতের বিশালতায় নিয়ে যেতে চাই।

খেয়াল করুন,রাবিয়া ইবনে আমীর রা. ধর্মতত্ত্বের ছাত্র ছিলেন না, তা সত্ত্বেও অন্যান্য সকল ধর্মের জুলুম তথা অবিচারের কথা বললেন।অন্য সকল ধর্ম সম্পর্কে তার জ্ঞান তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রয়োজন ছিল না,কারণ ওহীর জ্ঞান দ্বারা তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন যে,কেবল ইসলামই ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে,বাকি সব ধর্মই জুলুমের খোলস পরে আছে। ইসলামই মানবজাতিকে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ উপহার দিতে পারে।

বুয়াস যুদ্ধ মূলত: মদীনার জনগনকে আল্লাহর রাসুল সা. এর সাহাবী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করেছে। নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার মধ্যে দিয়ে ইসলামের ভবিষ্যত ভূখন্ড হিসেবে বুয়াস যুদ্ধ মদীনাকে প্রস্তুত করেছে। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে,ইসলাম গ্রহনের পূর্বে আনসাররা হজ করতে মক্কায় এসে মুহাম্মাদ সা. এর নবুওয়াতের সংবাদ শুনে তারা বলেছিলো,চলো আমরা এই ব্যক্তিকে আমাদের দেশে নিয়ে যাই। হয়তো আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে আমাদেরকে আবার ঐক্যবদ্ধ করে দিবেন।
তাঁরা তাঁদের নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে হরিয়ে সত্যিই বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলো। তাঁরা তাঁদের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব বোধ করছিলো। আসলেই মানব জাতির জন্য নেতৃত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। নেতৃত্ব ছাড়া মানবতা টিকে থাকতে পারে না। ভাল মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব প্রয়োজন। কল্যানকর কাজের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য হোক বা মন্দ কাজের দিকে এগিয়ে নেওয়া হোক,নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। নেতৃত্ব থাকতেই হবে। শয়তানের দলেরও নেতা থাকে। আর আল্লাহর দলেরও নেতা থাকে। এটা মানুষের স্বভাবধর্ম।
পথ প্রদর্শনের জন্য সে সব সময়ই নেতৃত্বের মুখাপেক্ষী।
মদীনার লোকদেরকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করেছিলেন। এর অন্যতম আরেকটি দিক হলো মদীনার লোকদের কাছেই ইহুদিরা বসবাস করতো। আর তাদের কাছ থেকে তারা একজন নবীর আগমনের কথা দীর্ঘ দিন থেকে শুনে

আসছিলো,যার কারনে তাদের কাছে নবী আগমনের বিষয়টি এতোটাই স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিভাত হয়,যা আরব উপদ্বীপের অন্যদের সামনে ছিলো না। অন্যদের কাছে নবী আগমনের বিষয়টি এতটাই আলোচিত বিষয়ও ছিলো না। মদীনার আনসারদেরকে ইহুদিরা বিভিন্ন সময় এই বলে হুমকি দিতো যে,শ্রীঘ্রই আমাদের মাঝে একজন নবী আসবে এবং এরপর আমরা তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবো,যেভাবে আদ জাতিকে হত্যা করা হয়েছিলো।

অথচ আমরা দেখতে পাই যে, নবী ঠিকই এসেছেন কিন্তু স্বভাবের গোয়ার্তুমী আর মনের বক্রতার কারনে সেই ইহুদীরাই হিদায়াত পেলো না,যারা সেই নবী আগমনের খবর অন্যদেরকে শুনাতো।
আল্লাহ সুবনাহু তাআলা চাইলেন মদীনার আনসাররা ইসলাম গ্রহন করুক এবং তাঁর নবীর সাহায্যকারী হোক। আনসাররা বুয়াস যুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করছিলেন ঠিকই কিন্তু তারা কি ঘূণাক্ষরেও জানতেন যে এই যুদ্ধ কিভাবে তাদেরকে ইসলামের নিকটবর্তী করতে যাচ্ছে।বুয়াসের যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণভাবেই একটি জাহিলিয়াতের যুদ্ধ,কিন্তু তা তাদের আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত করছিল। সবার অজান্তে এ যুদ্ধ তাঁদেরকে আল্লাহর নিকটতম প্রিয় বান্দা হওয়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকম অবস্থা তৈরী করেন,যার অর্ন্তনিহিত রহস্য হয়তো মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না।

দ্বিতীয় উদাহরণ:
এটি দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর সময়ের ঘটনা। তিনি পারস্যে সম্রাজ্যে বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তিনি এই মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন আবু উবায়দা আর সাকাফী রা. কে। সেনাপতি আবু উবায়দা আল সাকাসী রা. ছিলেন অত্যন্ত অকুতোভয় ও অসীম সাহসী বীর যোদ্ধা। তবে ঘটনাক্রমে তিনি এই যুদ্ধে এমন কয়েকটি ঝুকি নিয়ে ফেলেন যা না নিলেও চলতো। আর এই মাত্রাতিরিক্ত ঝুকির কারনে জিসর বা সেতু যুদ্ধে মুসলমানদের ভাগ্যে এক পর্যায়ে পরাজয়ের গ্লানি নেমে আসে। সেদিন মুসলিম বাহিনীর প্রায় অর্ধেক সংখ্যক সৈন্য শহীদ হয়ে যায়।

পারস্যে বাহিনী তখন ভাবছিলো যে,বাকি মুসলিম বাহিনীকে নির্মূল করে দেয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ।আর যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চিতভাবে তাদের অনুকূলেই াকবে। তারা ভাবছিলো,মুসলমানরা যেসব এলাকা ইতিপূর্বে দখল করে নিয়েছিলো এবার তাঁদেরকে সে সব এলাকা থেকেও উতখাত করে দিতে তারা সক্ষম হবে।
বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ আত তারীখুল ইসলামীর লেখক জনাব মাহমুদ শাকির বর্ণনার এ পর্যায়ে এসে লিখেছেন,কিন্তু ঈমানদারদের সাথে রয়েছেন স্বয়ং মহান আল্লাহ সুবনাহু তাআলা। ঈমানদাররা যদি বিজয়ের শর্তগুলো সঠিকভাবে পূরন করতে সক্ষম হয়,তাহলে আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে বিজয় দান করবেন,তা যেভাবেই হোক না কেন। তাতে তাঁদের সৈন্যসংখ্যা বিশাল হোক না কেন। তাঁদের কাছে পারমানবিক বোমা থাকুক বা না থাকুক। এ সকল উপায় উপকরণ এমন কোনো বিষয় নয়,যা পরিসিস্থতিকে নিয়ন্ত্রন করে। ঈমানদাররা যদি ঈমানের দাবি মোতাবেক তাঁদের দায়িত্ব কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে,তাহলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বিজয় দান করবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,
অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ তাআলা বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞদেরকে মোটেই ভালবাসেন না। (সূরা হজ: আয়াত ৩৮৮)

আল্লাহ তাআলা এ কথা বলেননি যে,তিনি তাদেরকে রক্ষা করবেন,যাদের অনেক অস্ত্রসস্ত্র আছে,যারা সংখ্যায় অনেক। বরং তিনি তাাদের রক্ষা করার কথা বলেছেন যাদের ঈমান আছে,আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য এটাই হলো শর্ত যা আমাদেরকে পূরণ করতে হবে। তাই বাহ্যিক অবস্থা দেখে যদিও মনে হচ্ছিল যে মুসলমানরা এ যুদ্ধে হারতে যাচ্ছে,কিন্তু আল্লাহ তআলা এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিলেন,যার পরিপ্রেক্ষিতে রাত পোহাতে না পোহাতেই বিজয়ের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ঝুঁকে পড়লো।
যখন যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানরা একেবারে পরাজয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছিলো,ঠিক তখনই পারস্য সম্রাজ্যের রাজধানীতে আল্লাহ তাআলা এক বিপর্জয় ঘটিয়ে দিলেন। পারস্য সম্রাজ্যের দুই প্রধান নেতা একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। যার

ফলে সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে অর্ধেক সেনাপতি রুস্তমের পক্ষ নেয় আর বাকি অর্ধেক সম্রাটের পক্ষ নেয়।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত বাহিনীর দায়িত্বে থাকা সেনাপতিকে রাজধানীতে জরুরীভাবে তলব করা হয়। সেনাপতি রাজধানীতে ফিরে যাওয়ার কারনে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে। আর এই সময়টুকু মুসলমানদের জন্য হয়ে দাঁড়ায় একটি সুবর্ণ সুযোগ। খলীফাতুল মুসলিমীন উমর রা. পর্যাপ্ত সময় পেয়ে যান দ্রুত সৈন্য পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করার এবং যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারনের।
আলোচ্য ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে,ঠিক সেই মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা পারস্য সম্রাজ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীন কলহ লাগিয়ে দিয়েছেন,যখন মুসলিমদের জন্য তা দরকার ছিলো। আল্লাহ তাআলা চাচ্ছিলেন সেই এলাকায় ইসলামের পতাকা উড্ডীন হোক। আর এদিকে মুসলিমরাও তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। তাই সেখানে দেখা যাচ্ছিল যে মুসলিমরা পরাজয়ের একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে,সেখানে সেই অবস্থা পরিবর্তন করে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন।

তৃতীয় উদাহরণ:
এই উদাহরনটি আমরা নিব ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস থেকে। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেয়ার কারনে মুসলমান শসকরা যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিলো,তখন পবিত্র ভূমি রক্ষার জন্য সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. মুসলিদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করলেন। পবিত্র ভূমির আশপাশের মুসলিদের সংঘবদ্ধ করে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মনস্থ করলেন। অথচ তার পূবে কোন মুসলিম নেতাই এ ব্যাপারে সাহসী উদ্যোগ নিতে পারেনি।কাপুরুষ শাসকরা কাফিরদের ভয়ে চরমভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিলো।অথচ কাফিররা শামের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও জেরুজালেমসহ গোটা সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ দখন করে নিয়েছিলো।

সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর এই প্রস্তুতির খবর যখন ক্রুসেডাররা শুনলো তখন তারা বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করলো।কারণ তারা জানত যে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে। তারা জানতো যে সালাহ উদ্দীন আইউবী রহ. কোনো সাধারন ব্যক্তির নাম নয়।

এদিকে মুসলমানদের মধ্যে কিছু আলিম উলামা ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা আরম্ভ করলো দু:খ জনক বিরোধীতা। তারা সালাহ উদ্দিনকে অতি উতসাহী বলে তাঁর কঠোরর সমালোচনা শুরু করলো। রোম সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনাকে তারা পাগলামো বলে সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. কে তিরস্কার করতে লাগল। তারা বলতে লাগল যে,রোম এত বড় এক বিশাল সম্রাজ্য,যাকে বলা হয় কূল কিনারাহীন সমুদ্র। তারা রোম সম্রাজ্য ও ইউরোপকে এতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলো যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা তারা চিন্তাই করতে পারছিল না।তারা চিন্তা করছিল যে, গোটা ইউরোপ তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আর অন্যদিকে মুসলিমরা হলো শতধাবিভক্ত। অতএব এমন একটি বিভক্ত জাতি নিয়ে বিশাল সামরিক শক্তিধর ঐক্যবদ্ধ ইউরোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার অর্থ হলো মুসলমানদেরকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া।

কিন্তু সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. একমাত্র আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে এগিয়ে চললেন। তিনি ক্রুসেডারদের সাথে যুদ্ধ ঘোষনা করেন এবং তাদের থেকে মুসলমানদের ভূখন্ড পুনরুদ্ধান করার অভিযান আরম্ভ করেন।উম্মতের সামান্য কিয়দাংশ নিয়েই তিনি যুদ্ধ করছিলেন।
এই অবস্থা দেখে পোপ গোটা ইউরোপকে আর একটি নতুন ক্রুসেডের জন্য সংগঠিত করতে আরম্ভ করে,যেটা চতুর্থ এবং এটা ছিলো সর্ব বৃহত ক্রুসেড। কারন এটি ছিলো সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর বিরুদ্ধে।

মুসলিমদের সামরিক নেতৃত্বে এবার সালাহ উদ্দিন রহ. কে দেখে এই যুদ্ধকে খৃষ্টানরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলো এবং তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং সেনা নায়ক নিয়োগ দেখেই বোঝা যায় যে তারা এই যুদ্ধকে কেমন গুরুত্ব দিয়েছিল।আমরা দেখতে পাই যে এই যুদ্ধে তারা কোন জেনারেলদের উপর

দায়িত্ব না দিয়ে স্বয়ং তাদের শাসক রাজা বাদশারা নিজেরা যুদ্ধের ময়দানে এসে সরাসরি নেতৃত্ব দেয়া শুরু করেছিলো। ইংল্যান্ড,ফ্রান্স ও জার্মানির রাজারা নিজেরা সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালার জন্য বেড়িয়ে পড়েছে এবং তারা নিজ নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছে। ইংল্যান্ড,জার্মী ও ফ্রান্স যখন একই সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে তখন তাদের সেনাবাহিনীর আকার এতো বিশাল হয়ে দাঁড়ায় যা ততকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে অস্বাভাবিক ধরনের এক বিশাল সেনাবাহিনী হিসেবে আর্বিভুত হয়।ইতিহাস থেকে জানা যায় শুধু জার্মান কিং ফ্রেডরিক বার্বোরোজ একাই তিন লক্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করে। ততকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে তিন লক্ষ সৈন্যের কোনো বাহিনীর কথা শুনলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এমনিতেই যে কোনো মানুষ মূর্ছা যাওয়ার কথা। সম্মিলিত ইউরোপিয়ান বাহিনী এত বিশাল আকার ধারন করে যে,তাদের নৌ বাহিনীর জাহাজ এবং ইউরোপিয়ান বাণিজ্যিক জাহাজগুলো দিছের তাদেরকে বহন করে আনা সম্ভব হচ্ছিল না।তাই ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের সৈন্যরা নৌ জাহাজে যাত্রা করলেও জার্মান বাহিনীকে স্থল পথে যাত্রা করতে হয়।

এবার আসুন আমরা একটু জেনে নেই,ঐ সময়ে ততকালীন মুসলিম সমাজের তথাকথিত কতিপয় আলেম উলামাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিলো এবং তারা কি ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ইবনে আসীর রহ. বলেন,ইউরোপিয়ানরা নৌপথ ও স্থল পথে এগিয়ে আসছিলো মুসলিমদের উপর আক্রমন করতে। চারিদিকে খবর ছড়িযে পড়লো যে শুধু জার্মান কিং একাই তিন লক্ষ দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আক্রমন করতে উত্তর সীমান্ত দিয়ে এগিয়ে আসছে।

আলেম উলামাদের অনেকেই প্রথমে নিজেদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন যে তারা শাম অঞ্চলে গিয়ে শত্রুদের মোকাবেলায় আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কিন্তু পরক্ষনে তারা যখন নিশ্চিতভাবে ইউরোপীয় বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারলেন,তখন তাদের অনেকেই পিঠ টান দিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে ফিরে আসলেন।

এখানে প্রশ্ন হলো তারা কেন পিছু হটে ছিলেন? সংখ্যা বেশি হলে কি ফিকহের পরিবর্তন হয়? তারা জিহাদে নিয়তে বের হয়েছিলেন,পরে সংখ্যাধিক্যের কারনে ফিরে যান,অথচ তারা ছিলেন আলিম। এখানে একটি শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে আর তা হল নিস্পাস,মাসুম বা ভুলের উর্দ্ধে নন। তারা আম্বিয়া নন। আলেমগন মানুষের মধ্যে থেকেই এসেছেন। তারা কখনো হকের উপর থাকবেন,আবার কখনো হকের পথ থেকে বিচ্যুত ও হয়ে যেতে পারেন। এ কারনেই এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে,মানুষ অন্ধভাবে আলিমদের পিছনে ছুটলে সব সময়ই তারা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।তবে এটা আবশ্যক নয় যে একেবারে সব আলিমগন হক থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন। কিছু আলিমদের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে,সকল আলিমগনের ক্ষেত্রে নয়।

ইবনে আসীর রহ.ও কিছু সংখ্যক আলিমদের পিছনে ফিরে যাবার কথা বলেছেন।তিনি বলেছেন,তাদের বিরাট একটি অংশ ময়দান ছেড়ে চলে এসেছিলো।তবে একটি অংশ সর্বদাই অটল ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,হযরত সাওবান রা. এর এক বর্ণনায় রাসুল সা. বলেন,
অর্থ: এই উম্মতের মধ্যে সব সময়ই এমন একটি তাইফা (দল) থাকবে,যারা হকের উপর অটলভাবে টিকে থাকবে।(সহীহ মুসলিম,কিতাবুল ইমারাহ)

ঘটনা হলো সাধারন জনগনের অনেকেই নিজেদের বিবেক দিয়ে তাদের দায়িত্ববোধ উপলব্ধি করতে পারলেও অনেক সময় দায়িত্ব এড়ানোর জন্য তাদের বিবেক বোধকে হকের পথ থেকে বিচ্যুত কতিপয় আলেমদের সাথে জুড়ে দেন। তারা বলতে থাকেন যে আমাদের আলেমরা তো এই
কথা বলেন না।
এমন আরও অনেক লোক আছে যারা দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেতে আলেমদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলে যে,অমুক আলেম এরূপ কোন ফতুয়া দেননি,অমুক আলিক জিহাদে যেতে বলেননি। অর্থ্যাত তারা আলেমদের দোষারোপ করে,যদিও এমন অনেক উলামায়ে কেরাম রয়েছেন যারা ঐ মতের বিপরীতে সত্য তুলে ধরেছেন।

আর কুফরী নিয়ন্ত্রিত সমাজে হকপন্থী আলিমদের অতোটা নাম ডাক না থাকার কারনে তাদের
কথা জনগনকে সঠিকভাবে জানতেও দেয়া হয় না।
তাদেরকে হয় তাগুতরা হত্যা করে ফেলে,অথবা তাদেরকে কারারুদ্ধ করে রাখেত,অথবা তাদেরকে গোপনে লুকিয়ে থাকতে হয়। তারা তো কেউ কুফুরী সমাজে বিখ্যাত হতে পারেন না। কারন তাদের খুতবা রেডিও টেলিভিশন সম্প্রচার করা হয় না।আর বর্তমান যুগের এক মারাত্মক ফিতনা হলো যে আজকাল কে কতো বড় আলেম,তা মাপা হয় নাম জশ ও খ্যাতি দিয়ে। যে যতো বেশি বিখ্যাত সে তাতো বড় আলেম। অথ চ এটা মোটেও গ্রহনযোগ্য মানদন্ড নয়।

একটা সময় ছিল যখন সত্যিকারের ইলম এবং উস্তাদদের প্রত্যয়নই ছিলো আলিম হওয়ার মানদন্ড। পূর্বে আলেমগনের সাক্ষ্যের ভিক্তিতে কাউকে আলেম রূপে গন্য করা হত। শিক্ষক বা উস্তাদ দান শেষে ছাত্রকে আলেম হিসেবে ঘোষনা দিতেন।অধিকাংশ আলেমদের মতে যে সর্বাধিক ইলম সম্পন্ন সেই ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত। কিন্তু কালের বিবর্তনে এ পদ্ধতি আজ প্রায় উঠে গেছে। এখন সরকারীভাবে আলিমদের নিয়োগ দেওয়া হয়। এখন কেউ আলিমগণের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্তে নয় বরং সরকারী নির্দেশে সহসাই পোষ্যআলেমে পরিনত হয়।এখন সরকারি নিযোগের কারনে রাতারাতি অনেক ব্যক্তি বিখ্যাত আলেম হয়ে যায়। যে যতো বড় সরকারি পোষ্টে আছে,যাকে যতো বেশি স্যাটেলাইট টেরিভিশনের পর্দায় দেখা যায় সে ততো বড় আলেমে পরিনত হয়।স্যাটেলাইট চ্যানেল ও রেডিও স্টেশনে বিভিন্ন প্রোগ্রামে আর্বিভুত হয়ে বিখ্যাত আলেম হিসাবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। অথচ এমন পদ্ধতিতে সাধারনত: আপোষকামী ও দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বী ন বিক্রিকারী ব্যক্তি ব্যতীত কারো পক্ষেই বিখ্যাত আলেমের খেতাব পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদেরকে এই ধোকার পিছনে পড়লে চলবে না।আমাদেরকে হকের কথা বলতে হবে এবং হকের কথা শুনতে হবে।তা যেখানেই থাকুক না কেন?

আসুন মুল ঘটনায় ফিরে যাই। ইবনে আসীর রহ. বলেন,শত্রুদের সংখ্যা শুনে আলেমদের অনেকেই যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তারা যেহেতু

আলেম ছিলেন,তাই তারা তাদের পলায়নের বৈধতার জন্য অজুহাত ও দলীল খুঁজতে লাগলেন।আর তাদের জন্য তো দলীলের তো কোন অভাব হয় না।কারন তারা জানেন আল্লাহর আয়াত ও রাসুল সা. এর হাদীসের অর্থ কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় এবং কিভাবে নিজের মনগড়া কাজকে শরীয়তের মানদন্ডে বৈধতা দিতে হয়। তারা যেহেতু আলেম তাই তারা কখনোই তাদের অন্তরের মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে পড়া শত্রুদের ভয়ের কথা প্রকাশ করবেন না,নিজেদের দূর্বলতা প্রকাশ করে তারা কখনোই বলবেন না যে,আমরা কাপুরুষ,তাই_ আমাদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সম্ভব নয়। বরং কুরআন হদীসের অপব্যাখ্যা করে নিজেদের দুর্বলতাকে গোপন করার জন্য হয়তো বলবে,এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়াটা উম্মাহর বর্তমান অবস্থায় হিকমাহর খিলাফ। এর মাঝে কোন বিচক্ষনতা নেই।

কিংবা সালাহ উদ্দিন একজন অবুঝ,আমরা তাকে বারবার নিষেধ করার পরও সে আমাদের কথা শুনছে না। তাছাড়া সালাহ উদ্দিনের নেতৃত্ব মেনে নেয়া যায় না,কারন সে তো বড় কোন আলেম নয়।সে তো ভালো করে আরবি বলতে পারে না।কে তাকে অধিকার দিয়েছে সুতরাং শক্তিধর প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় নেমে এতো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং উম্মতকে এতো বড় বিপদের মধ্যে ফেলার ? তার উচিত আলেমদের কাছে এসে আগে ফতোয়া নেয়া,কিন্তু সে তা করেনি্। অতএব সে তার একা গিয়ে যুদ্ধ করে মরুক। এসব কথা বলে আলেমদের একটি বড় অংশ চলে গেলো।

কিন্তু কি হলো তারপর?

এর পরের ঘটনাও আমরা সবাই জানি। মূলত: এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। এটি ছিলো আলিমদের জন্য একটি পরীক্ষা,সালাহ উদ্দিনের জন্য এবং গোটা উম্মতের জন্যও একটি পরীক্ষা।

একদিকে ইউরোপের বিশাল বাহিনী মুসলিমদেরকে সমূলে উতখাত করার জন্য ধেয়ে আসছিলো,আর অন্য দিকে মুসলিদের মধ্যে চলছিলো ফতোয়াবাজি আর অনৈক্যের প্রচন্ড ঝড়।সবশেষে মুসলমানদের একদল বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পালিয়ে গেলো আর স্বল্প সংখ্যক হলেও একদল আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য অটল অবিচলভাবে

সামনে এগিয়ে গেলো। ঠিক যেমনিভাবে আল্লাহ সুবনাহু তাআলা বনী ইসরাইলদেরকে সমূদ্রের সামনে এনে পরীক্ষা করেছিলেন। এটা ছিলো মুমিনদের জন্য একটি পরীক্ষা।আল্লাহ সব সময়ই মুমিনদেরকে এভাবে পরীক্ষা করে থাকেন।তিনি কোন মুমিনের ধ্বংস চান না।,তিনি শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিকার ঈমানদারদেরকে বাছাই করে মুনাফিকদের থেকে আলাদা করে নেন।

আমরা জানি যে যখন মুসা আ. নীল নদের সামনে এসে পৌছলেন তখন কি অসবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো? সামনে নীল নদ আর পেছনে ফিরাউনের বাহিনী দেখে বনী ইসরাইলরা মুসা আ. এর সামনে এসে বলতে লাগলো,তুমি আমাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলে,তুমি বলেছিলে যে,আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন ,হেফাজত করবেন। আর আমরা এখন মৃত্যুর সম্মুখীণ্ । আমাদের সামনে সমুদ্র আর পিছনে ফেরাউনের বাহিনী।সুতরাং এখান থেকে আমাদের আর বাচার উপায় নেই।

এই কঠিন অবস্থায় মুসা আ. কি জবাব দিয়েছিলেন,আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামের মাধ্যমে আমাদেরকে সেই অসাধারন ঐতিহাসিক জবাবটি জানিয়ে দিয়েছেন। মুসা আ; বলেছিলেন,
অর্থ: (মুসা) বললেন,কখনই নয়,নিশ্চয়ই আমার রব আমার সাথে আছেন,তিনি আমাকে অচিরেই পথ দেখাবেন।(সুরা আশ শুয়ারা: আয়াত:৬২)।
অটল অবিচল সত্যিকার ঈমানের কি অসাধারন বহি:প্রকাশ।সামনে নীল নদ,পেছনে ফেরআউনের বাহিনী স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও যেন তিনি বলেছেন,আমি আমার চোখকে অবিশ্বাস করি,যখন সামনে সমুদ্র ও পেছনে ফিরআউনের বাহিনীকে দেখি।আমি আমার কানকে অবিশ্বাস করি যখন বনী ইসরাইল আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ উথাপন করে। আমি কেবল আমর আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমানে আস্থা রাখি। যেহেতু মহান আল্লাহ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,তিনি অবশ্যই তা পূরন করবেন। বাহ্যিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন,তাতে কিছু আসে যায় না।
এভাবে তিনি যখন ঈমানের পরীক্ষায় পাশ করলেন তখন মহান আল্লাহ তাকে নির্দেশ দিলেন তার লাঠি দিয়ে নীল নদের পানির উপর আঘাত করতে। এরপর কি হয়েছিল তা আমাদের সবারই কমবেশি জানা আছে। এভাবে মহান আল্লাহ বনী ইসরাইলকে

যাচাই করে নিলেন যে কে তাদের মধ্যে ঈমানের প্রশ্নে অটল অবিচল,আর কার ঈমান ঠুনকো,শুধু মৌখিক দাবী।

সালাহ উদ্দিন আইউবীর সময়ও এই একই ঘটনা ঘটলো। এটা ছিলো ঈমানের পরীক্ষা।পরীক্ষার মাধ্যমে ঈমানদার আর ঈমানের ভূয়া দাবীদারদেরকে আল্লাহ তাআলা আলাদা করে নিলেন তখন আল্লাহ নিজ কুদরতেই মুসলিমদেরকে বিজয় দান করলেন। ফ্রেডারিক বার্বরোজ যে তিন লক্ষ সৈন্য নিয়ে রওয়ানা দিয়েছিলো তাদেরকে আল্লাহ কিভাবে শায়েস্তা করলেন,আসুন আমরা দেখে নিই।
তাদেরকে পথিমধ্যে এমন একটি নদী পার হতে হল,যে নদীতে বরফ গলা পানি প্রবাহিত হচ্ছিল যার কারনে পানি ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা। একদিকে প্রচন্ড গরম আবওহাওয়া,অপরদিকে প্রচন্ড ঠান্ডা। সব মিলিয়ে ক্রুসেডার বাহিনী এক মহা বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়লো। আর তাদের সেনাপতি ফ্রেডরিক বার্বারোজ ছিলো সত্তোরোর্ধ বয়সের বৃদ্ধ।লৌহবর্ম দিয়ে তার শরীরের মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত ছিলো। আসলেই কাফিররা কখনো মুসলিমদের মত হালকা সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধ করতে সাহস পায় না। ঠিক যেভাবে আল্লাহ বলেছেন,
অর্থ: ওরা সংঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না। ওরা যুদ্ধ করবে কেবল সুরক্ষিত জনপদে অথবা দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে।তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রবল শক্তিধর মনে করে,তুমি তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করেছ অথচ তাদের অন্তসমূহ বিচ্ছিন্ন। এটি এজন্য যে,তারা নির্বোধ সম্প্রদায়। (সুরা আল হাশর: আয়াত ১৪১)
হতে পারে এই দূর্গ বাঙ্কার,অত্যাধুনিক কোনো ট্যাংক বা আর্মার্ড ভেহিকল বা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে নির্মিত কোনো যুদ্ধ বিমানের ককপিট। একবার তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত জায়গা থোকে বের করে আনতে পারলে হয়েছে। ব্যাস। তাদের অবস্থা একবারে শেষ।

এ কারনেই ইমাম ইবনুল কাইউম রহ. বলেন,আকার আকৃতিতে সাহাবায়ে কিরামগন তাদে শত্রতের চেয়ে বিশাল বড় কিছু ছিলেন ান,তাদের সামরিক ট্রেনিং তাদের চেয়ে উন্নত ছিলো না,তাদের যুদ্ধাস্ত্র,সাজ সরঞ্জাম তাদের চেয়ে কখনোই বেশি ছিলো না।

বরং সব সময়ই কম ছিল। কিন্তু তাদের ছিলো বিশাল এক অন্তর। ছিলো অন্তরের অটল অবিচল ধৈর্যও সাহসিকতা। যা যুদ্ধের সব চেয়ে বড় ও প্রয়োজনীয় অস্ত্র।কাফিরদের সেই অন্তর,সেই প্রধান অস্ত্র তখনই বিফল হয়ে যায় ,যখন তার প্রয়োজন সব চেয়ে বেশি। সাহাবায়ে কিরামদের সাহস ও ঈমানের চেতনায় শত্রুপক্ষ হেরে যেত।

সাহাবায়ে কিরামদের বিশাল হৃদয় ,অবচল ধৈর্য্য ও সাহসিকতা ছিলো। তারা জীবনের চেয়ে আল্লাহর পথে মৃত্যুকে বেশি ভালবাসতেন পক্ষান্তরে কাফিরদের জন্য এই শক্তি অর্জন কখনই সম্ভব নয়। কারন তরা সব সময়ই জীবনকে সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালবাসে আর মৃত্যুতে চরম ভয় পায়। তাই মুসলমানদের মতো সাহসিকতা াতারা কখনোই অর্জন করতে পারে না। চাই তাদের সাজ সরঞ্জাম,অস্ত্রশস্ত্র ও ট্রেনিং যতোই উন্নত হোক না কেন। যুদ্ধ জয়ের আসল অস্ত্র অর্জন করা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সর্বাধুনিক সমরাস্ত্র,বর্ম ,প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনী অর্থ্যাত বিজয়ের সব উপকরনই কাফিরদের মজুদ থাকলেও মনোবলের অভাবেই ওরা হেরে যেত।

ফ্রেডারিক বার্বারোজ ঘোড়ায় চড়ে অল্প পানির একটি খাল পার হচ্ছিল আর হটাত কেন যেন তার ঘোড়াটি অস্বাভাবিক কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে লাফানো শুরু করলো। ফলে ফ্রেডারিক বার্বারোজা ঘোড়া থেকে ছিটকে পানির মধ্যে পড়ে গিয়ে হার্ট এটাক করে সেখানেই মারা গেলো।
ইমাম ইবনে আসীর রহ. তার মৃত্যুর ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন,জার্মান কিং ফ্রেডরিক সামান্য হাটু পানিতে ডুবে মারা গেল।অথচ ফ্রেডারিক বার্বারোজ ছিলো এমন একটি নাম যা শুনলে গোটা দুনিয়ার মানুষের হৃদয়ে কম্পন শুরু হয়ে যেত। যে ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী বীর যোদ্ধা ও প্রতাপশালী শাসক,আল্লাহ তাকে সামান্য হাঁটু পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন।

জার্মান কিং এর মৃত্যুর পর ক্রুসেডারদের মধ্যে অনৈক্য ছড়িয়ে পড়লো। এছাড়া দীর্ঘ যাত্রা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারনে তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম রোগ ব্যধিও ছড়িয়ে পড়লো। এভাবে তারা যখন শাম দেশে গিয়ে পৌছল তখন তাদের অবস্থা এমন ছিল

যে,তাদেরকে মাত্র কবর থেকে টেনে বের করা হয়েছে। শুধু তাই নয় পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ আর পলায়ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত যখনএই তিন লক্ষ সেনাবাহিনীর বহর আল বাক্কা গিয়ে পৌছেছিল,তখন তাদের সংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে তিন লাখ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিলো মাত্র এক হাজারে। তিন লক্ষ থেকে মাত্র এক হাজার সৈন্য শেষ পর্যন্ত এস পৌছলো সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর মোকাবেলা করার জন্য।

এখন আপনিই বলুন কে বুদ্ধিমান প্রমানিত হলো? সালাহ উদ্দিন না সেই তথাকথিত আলেম,যারা যুদ্ধের কথা শুনে কাপুষের মতো পলায়ন করেছিল?

এই ফ্রেডারিক বার্বারোজা সালাহ উদ্দিন কে অহংকার ও দাম্ভের সাথে চিঠি লিখে হুমকি দিয়েছিল যে সালাহ উদ্দিন যদি বার মাসের মধ্যে এই অঞ্চল থেকে তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার না করে,তাহলে তাকে দেখে নেবে,এই বরবে সেই করবে...। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন অহংকারী বার্বারোজকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে। আর তিনি তা একবারে সহজভাবেই করে ছাড়লেন। বার্বারোজ শপথ করেছিলো যে সে ফিলিস্তিনের পবিত্র মাটিতে মা রাখবেই,কিন্তু আল্লাহ তাকে তার শপথ পূরণ করতে দিলেন না। ফিলিস্তিনে আসার আগেই যখন সে মারা গেল,তখন পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে পুত্র মৃতদেহটি পানিতে সিদ্ধ করে ভিনেগার মিশিয়ে একটি ড্রামে সংরক্ষন করল। কিন্তু মুতদেহটি পঁচে গলে ড্রামটি ফেটে বের হয়ে গেল। আর তার পুত্র অবশেষে বাধ্য হলো তাকে পথিমধ্যে এক জায়গায় মাটি খুড়ে পুঁতে রাখতে । সে তার সামান্য শপথটুকুও পূরন করতে পারল না।

অতএব হে কাফিররা! হে কাফিরের দোসর মুনাফিকরা! তোমরা ভালো করে জেনে রাখো,আল্লাহর দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করতে চায়,আল্লাহ সুবনাহু ওয়া তাআলা তাদের পরিনতি এমনই করে থাকেন।তোমরা (সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে) ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেছো তাদের পরিনতি ও এমনই হবে।

ইবনে আসীর রহ. বলেন,আল্লাহ যদি নিজ দয়ায় ,নিজ কৌশলে উম্মতের কল্যানের জন্য ফ্রেডারিক বার্বারোজকে হত্যা না করতেন তাহলে আজ হয়তো আমরা বলতাম অতীতে কোন একটা সময় ছিল যখন সিরিয়া ও মিশর মুসলমান দেশ ছিল।পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ছিল যে আল্লাহ সুবনাহু তাআলা দয়া করে যদি মুসলমানদেরকে বিজয় দান না করতেন তাহলে আমরা হয়তো মিশর ও শাম (জর্ডান,লেবানন ও সিরিয়া) গোটা অঞ্চলটিকেই হারিয়ে ফেলতাম এবং হয়তো আমাদেরকে বলতে হতো যে অতীতে এমন একটি সময় ছিল যখন সেখানে মুসলিমরা বসবাস করতো।

কিন্তু মহান আল্লাহ তার বান্দাদেরকে বিজয় দান করতে চেয়েছেন। অতএব তারা তিন লক্ষ সৈন্য পাঠালো না তিন বিলিয়ন পাঠালো তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহ যখন পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে চান,যদি কোন অবস্থার সমাপ্তি চান,যদি এই উম্মাহকে আবারও বিজয় দান করতে চান তাহলে তিনিই এমন পরিস্থিতি তৈরী করবেন যা উম্মাহর বিজয়কে ত্বরান্বিত করবে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

আমরা এই দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানতে পারলাম যে,আমাদের উল্লেখিত মূলনীতিটি একটি প্রমানিক সত্য মূলনীতি। এবার আসুন আমরা বর্তমান যুগের অবস্থার উপর কিছু আলোকপাত করি।

১ম দ্রষ্টব্য: আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই বর্তমান সময়ের পরিস্থিতির সাথে সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর সময়ের মিল রয়েছে। এর মানে কি এই দাঁড়ায় যে,পরবর্তীতে সে রকমই ঘটবে যা সে সময় ঘটেছিল?
তাহলে কি আমরা ধরে নেবো যে আমাদের পরবর্তী পরিস্থিতিও সালাহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর পরবর্তী পরিস্থিতির মতো হবে?
বিষয়টি বোঝার জন্য আসুন আমরা জেনে নেই যে সাল্াহ উদ্দিন আইউবী রহ. এর বিজয় অর্জনের পূর্বের পরিস্থিতি কেমন ছিল।

ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি যে,ততকালীন সময়ে আলেম উলামাদের মাঝে দলাদলি ,খিলাফতের মধ্যে ভাগাভাগি,সাধারণ জনগনের মধ্যে কোন্দল,মোটকথা মুসলমানদের অবস্থা মারাত্মক খারাপ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।
ঐতিহাসিক ইবনে কাসীর রহ. বলেন,সে সময় খিলাফাহ মারাত্মকভাবে দূর্বল হয়ে পড়েছিল।খিলাফাহ শুধু বাগদাদেই শাসনকার্য পরিচালনা করছিল।কেন্দ্রীয় খিলাফাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানরা ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল।

বাগদাদের বাইরে কেন্দ্রীয় খিলাফতের তেমন কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না।বসরা নিয়ন্ত্রণ করত ইবনে রাইক,খুজিস্তান ছিল আবু আব্দুল্লাহর দখলে। পারস্যে অঞ্চল ছিল ইমাদুদ দৌলার নিয়ন্ত্রনে । কারমান অঞ্চল ছিল আবু আলী বিন মুহাম্মাদ বিন বাযখ এর অধীনে। আফ্রিকা ও মাগরিব ছিল আল কাইম ইবনে মাহদীর অধীনে। খোরাসান ছিল আস সামানীর নিয়ন্ত্রণে।

এই চিত্রের মাধ্যমে আশা করি ততকালীন অনৈক্যের একটি চিত্র আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। অনৈক্যের দিক থেকে আমাদের বর্তমান উম্মাহর অবস্থার সাথে ততকালীন উম্মাহার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

আমরা এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো,ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। উম্মাহ যেহেতু বর্তমানে অধ:পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। অতএব এরপর উম্মাহর সামনে নিশ্চয়ই বিজয় অপেক্ষা করছে। তাই আমাদের বর্তমান দূরবস্থার কথা ভেবে মোটেই হতাশ হওয়া চলবে না। একথা মনে করা মোটেই ঠিক হবেনা যে,আমাদের এই অব্স্থার মনে হয় কোনো শেষ নেই। এমনটি ভাবার মোটেই কোনো কারন *াকতে পারে না। কারন পতনের শেষ সীমায় পৌছে গেলে তারপর কেবল উত্থান* ই বাকি থাকে। ব্যাস এখন আমাদের সামনে ইনশাআল্লাহ বিজয় অপেক্ষা করছে।

ইবনে আসীর রহ. মুসলিম জাতির দলাদলির আরো কিছু চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে বলেন,শুধু আন্দালুসেই মুসলিমরা চারটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং এর প্রত্যেক রাষ্ট্রনেতাই নিজেকে আমীরুল মুমিনীন বলে দাবী করতে থাকে। এমনকি আমীরুল মুমিনীনের মতহ গুরুত্বপূর্ন বিষয়টি একটি হাস্য কৌতুকের বিষয়ে পরিনত হয় । ক্ষমতার মোহে তারা অন্ধ ও উম্মাদ হয়ে পড়েছিল। ঠিক যেমন বর্তমান সময়ের শাসকরা ক্ষমতার মোহে অন্ধ। ক্ষমতার মোহে তাদেরকে কেমন উম্মাদ করে তুলেছিল তার একটি উদাহরন হলো শাসক রিদওয়ান। সে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য নিজের আপন দুই ভাইকে হত্যা করে এবং নিজের মসনদ ঠিক রাখতে গিয়ে সে পথ ভ্রষ্ট বাতেনী সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য চায়।

অপর একটি দৃষ্টান্ত হল ,আর রাহা নামে একটি শহর নিয়ে দুই আমীরের মাঝে বিবাদের সূত্রপাত হলো। তাদের একজন রোমান রাজার নিকট অন্য আমীরের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানায়। এমন ফিতনা ফাসাদের যুগে করতুবা নগরীতে উমাইয়া ইবন আব্দুর রহমান বিন হিশাম নামক এক ব্যক্তি রাজ প্রসাদের দখল নিতে প্রধান ফটকে এসে চিতকার করে বলতে থাকে যে,সেই হলো এখন এই রাজ্যের আমীর। কেউ একজন তাকে উপহাস করে বলে যে,শোনো উমাইয়াদের দিন এবার শেষ। তখন সে বলতে থাকে ,এক দিনের জন্য হলেও তোমরা আমাকে বাইয়াত দাও। আমাকে একটু আমীর হওয়ার স্বাদ আস্বাদন করতে দাও।তারপর তোমরা চাইলে একদিন পর আমাকে হত্যা করে ফেল।একদিনই আমার জন্য যথে ষ্ট। আমি এতেই সন্তুষ্ট থাকবো।

বর্তমান

বর্তমান সময়ের মত ধনী গরীবের ব্যবধানও তখন সমাজে মারাত্মক আকার ধারন করেছিল।একদিকে সমাজের ক্ষুদ্র একটি শ্রেনী বিত্তের পাহাড় গড়ে তুলেছিল,আর অন্য দিকে সাধারন মানুষের এক বিরাট অংশের অবস্থা ছিল নুন আনতে পান্তা ফুড়ানোর মতো।

ধনীদের বিলাসিতার আর দুনিয়া পূজার একটি উদাহরন হলো,সুলতান মিনিকশাহর কন্যার বিয়ে,যাতে প্রদত্ত মোহরানা ও উপঢৌকনের পরিমান ছিল ১৩০টি উট বোঝাই

স্বর্ণ ও রৌপ্য। অথচ সেই একই সময়ে কিছু মানুষ এত দরিদ্র ছিল যে কুকুরের মাংস খেয়ে জীবন ধারনে বাধ্য হয়েছিল।

৪৪৮ হিজরী সনে মানুষের খাদ্যভাব এতো চরম পর্যায়ে পৌছেছিল যে,এক ব্যক্তি সামান্য বিশ পাউন্ড ময়দা খরিদ করার জন্য তার মাথা গোঁজার আশ্রয়,বাড়ি ঘর বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। এই সময়ে উম্মাতের মধ্যে কর্মবিমুখতা,স্থবিরতা ও অলসতাও মারাত্মকভাবে জেঁকে বসেছিল।

ইমাম ইবনে আসীর রহ. তাঁর আল কামিল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,রোমানরা ৩৬১ হিজরীতে রাহা নগরী আক্রমন করলে রাহা নগরী থেকে সাহায্যের আবেদন নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল বাগদাদে মুসলিম খলিফা বখতিয়ার উবাইহীর নিকট আসেন। তারা গিয়ে দেখতে পান যে মুসলিম শাসক শিকার করা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তাদের অভিযোগ শোনার সময় তার নেই।

এ্ই ছিল সেই সময়কার মুসলিম শাসকদের অব্স্থা। যেখানে তার দায়িত্ব ছিল মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করার জন্য রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করার সেখানে তিনি ব্যস্ত আছেন শিকার নিয়ে। এ্টা আসলে নতুন কিছু নয়। উম্মাহর সাথে এমন উপহাস দুনিয়া পুজারী শাসকদের দ্বারা সব সময়ই হয়েছে।

এই তো সেদিনের কথাও স্পষ্ট মনে আছে, আরব দেশের বাদশাহ ওয়াশিংটন ডিসি ভ্রমনে এসেছিলেন।সেখানে স্থানীয় মুসলিম সমাজের লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তার পূর্ব নির্ধারিত দিন ছিল মঙ্গলবার। মুসলমানগন অনেক দিন থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন রকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তারা শুধু অপেক্ষা করছিলেন,কবে মঙ্গলবার আসবে। একদিন আগে হটাত সোমবার দিন দুতাবাস থোকে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে মঙ্গলবার বাদশাহ অন্য একটি জরুরী মিটিং এর কারনে মুসলিম কমিউনিটির সাথে নির্ধারিত অনুষ্ঠানে তিনি আসতে পারবেন না।

সাধারন মানুষজন ধারন করেছিলেন যে হয়তো নিশ্চয়ই আমেরিকা প্রসাশনের খুবই গুরত্বপূর্ন শীর্ষস্থানীয় কোনো ব্যক্তির সাথে এমন কোন জরুরী কাজ পড়ে গেছে,যেটা হযতো তার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। হতে পারে সেই মিটিংটা মুসলমানদের জন্য এই অনুষ্ঠানের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন।

আফসোস এই উম্মাহর জন্য ! পরবর্তীতে পত্রিকায় খরব বের হলো যে বাদশাহ সেদিন তার স্ত্রীকে নিযেয় একাধারে চার চারটি সিনেমা দেখার মহা আনন্দ উপভোগ করছেন। তিনি একটি সিনেমা শেষ করে আরেকটি সিনেমায় যাওয়ার জন্য বাদশাহ সারাদিন ভীষন ব্যস্ত ছিলেন৷ এতোই ব্যস্ত ছিলেন যে তার পক্ষে মুসলিম কমিউনিটির মিটিংয়ে আসা সম্ভব হয়নি!

এই ঘটনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে মুসলিম উম্মাহ তাদের জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব যাদের হাতে অর্পন করেছে,উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ববোধ,আন্তরিকতা ও ভালোবাসা কি পরিমান!

এরা তো এমন ব্যক্তি যাদেরকে মুদী দোকান চালানোর ব্যাপারেও বিশ্বস্ত মনে করা যায় না,অথচ তারা রাষ্ট্রপ্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ন আসন দখল করে আছে। গোটা উম্মাহর ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে আছে।

আবার এই উম্মাহর মধ্যে এমন কতিপয় বেকুবও আছে,যারা বলে থাকে যে আমাদের উচিত এই শাসকদেরকে বাইআত দেয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথা না বলা!

যাই হোক,চলুন আমরা সেই বাগদাদেন ঘটনার দিকে ফিরে যাই। রাহা থেকে প্রতিনিধিদল বাগদাদে এস খলীফাকে দেখলো যে তিনি শিকার করায় মহাব্যস্ত। তারা খলীফাকে বুঝালেন যে ,মুসলমানদের এই দু:সময়ে শিকার নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়। তার উচিত রোমানদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করা। খলীফা
এ কথা শুনে বললেন,আল্লাহু আকবার আসলেই তো আমার যুদ্ধ করা দরকার। কিন্তু যুদ্ধ করতে তো অর্থ দরকার ,তোমরা অর্থ সংগ্রহ কর। মুসলমানরা তাদের শাসককে

অর্থ সংগ্রহ করে দিল। অথচ সে সেই সমুদয় অর্থ তার ব্যক্তিগত শান শওকত ও ব্যসনে খরচ করে ফেললআর জিহাদের কথা বেমালুম ভুলে গেল।

ইবনে কাসীর রহ. বলেন যে,যখন ক্রুসেডররা শাম আক্রমনের পরিকল্পনা করে তখন লেবাননের ত্রিপলি থেকে বিখ্যাত আলেম কাযী আবু আলী ইবনে আম্মার বাগদাদে গমন করেন জনগনকে তাদের সাহায্যের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে। কেননা প্রতীকি অর্থে হলেও বাগদানকে তখনো খিলাফতের কেন্দ্র মনে করা হত। কাযী আবু আলী বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে এক জ্বালাময়ী ভাষন দেন। তিনি জনগনকে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পথে জান মাল দিয়ে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন। জনগনও তার বক্তৃতা শুনে বেশ উদ্বুদ্ধ হয় এবং তারা মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে অংশগ্রহন করার জন্য নিজেদের প্রস্তুতি গ্রহন আরম্ভ করে। আর সুলতান কাযী আবু আলীকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল যে বাদশাহর গাফলতির কারনে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহন করা হয়নি এবং কোনো বাহিনীও পাঠানো হয়নি। আর জনগনও বিষয়টি বেমালুম ভুলে গেল।

এদিকে কাযী আবু আলী নিজ এলাকায় ফিরে এসে দেখতে পান যে তার অনুপস্থিতে আল উবাই দিয়ীন নামক শিয়া গোষ্ঠী ত্রিপোলী দখল করে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাকে নিজের শহরও হারাতে হল।

সুতরাং শাসক শ্রেনীর এমন ভোগ বিলাস,দুনিয়া পুজা ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা নতুন কোনো বিষয় নয়। এটা অতীতে ও হয়েছে এবং তখনও আল্লাহ তাআলা এই উম্মাহকে রক্ষা করেছেন এবং বর্তমান এই অবস্থা ও তিনি পরিবর্তন করেএই উম্মাহকে রক্ষা করবেন।

দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য: আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে ভবিষ্যত পরিস্থিতি মোকবেলার জন্য প্রস্তুত করছেন। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. রচিত একটি কিতাব রয়েছে যার নাম হলো আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া তার এই কিতাবে গোটা মানবজাতির ইতিহাস,শুরু থেকে

শেষ,আদী অন্ত,পৃথিবী সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের বিষদ আলোচান রয়েছে। এই কিতাবে শেষ যামানায় ঘটিতব্য ফেতনা ফাসাদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সা. এর ভবিষ্যতদ্বানীগুলোকে এক অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে আলাদা করে শুধু আল ফিতান নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।

যদিও উম্মাতের ভবিষ্যত উত্থান হবে সামগ্রিক উত্থান এবং গোটা উম্মাতের উত্থান,তথাপিও ফিতান অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে রাসূল সা. এই উত্থানের ক্ষেত্র হিসেবে কোনো কোনো এলাকার উপর অন্য এলাকার চেয়ে বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন। যেসব এলাকার উপর আল্লাহর রাসূল সা. গুরুত্বারোপ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে ইরাক।
রাসূল সা. বলেছেন,ইরাকীরা ইমাম মাহদীর নিকটতম হবে।

এরপর রয়েছে খোরাসান। রাসূল সা. বলেছেন,যখন তোমরা দেখবে যে খোরাসান থেকে কালো পতাকাবাহী দল আসছে তখন তোমরা তাদের সাথে যোগ দিবে। কেননা তাদের মধ্যেই আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবেন।
এরপর রয়েছে শাম,বহু হাদীসে শামের ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে। আর শাম হলো গোটা ফিলিস্তিন,সিরিয়া,লেবানন,ইয়েমেন এবং জর্ডান অঞ্চল নিয়ে গঠিত।

এই মাত্র বিশ বছর আগেও এই সব অঞ্চলের অবস্থা কি ছিলো?
ইরাকে ছিলো বাথ পার্টির শাসন। যারা শাসনতান্ত্রিকভাবে ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদের অবস্থান ছিলো ধর্মের বিরুদ্ধে। গোটা আরব অঞ্চলের মধ্যে ইরাকীয়া ছিলো আল্লাহর দ্বীন থেকে সবচেয়ে দূরে।তারা মনে প্রাণে ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাথ পার্টিকে গ্রহন করেছিলো,তারা ছিল চরম জাতীয়তাবাদী।
আমি আক্ষেপ করে এক সময় বলতাম,আল্লাহই ভালো জানেন কবে এবং কিভাবে এদের অবস্থার পরিবর্তন হবে। আমার ধারনা ছিল এই ইরাক পরিবর্তন হতে যুগ যুগ ধরে সময় লেগে যাবে। সুবহানাল্লাহ! মাত্র কয়েকটি বছরের মধ্যে মহান আল্লাহ তাআলা ইরাকের মাটিকে কিভাবে ইসলামের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন।

জিহাদ শুরু হওয়ার পূর্বে খোরাসান (আফগানিস্তান অঞ্চল) ছিল কমিউজম দ্বারা প্রভাবিত। সেটা ছিলো একটি কমিউনিষ্ট দেশ। আচ্ছা বলুন তো,কমিউনিজম থেকে ইসলামের জন্য কি কোনো কল্যান আশা করা যায়? আশির দশকের শুরুর দিকে এই খোরাসান অঞ্চলে প্রথম জিহাদের খবর প্রচার হওয়া আরম্ভ করলো।
শামের কেন্দ্রবিন্দু হলো ফিলিস্তিন। এই তো সেদিও এই ফিলিস্তিনিরা আল্লাহকে এবং ইসলামকে অভিশম্পা করতো। তাদের খ্যাতি ও নাম ছিলো দুর্নীতি আর মদ্যপানে। এটা ছিলো ফিতনা ফাসাদে ভরা একটি রাষ্ট্র। সিরিয়া ছিল বাথ পার্টির নিয়ন্ত্রনে। লেবাননকে বলা হতো মধ্যপ্রাচ্যের প্যারিস। এটা ছিলো একটি পার্টি জোন। আরবরা যখন কোনো পার্টি করতে চাইতো তখন তারা বৈরুত চলে আসতো।
ইয়েমেন সম্পর্কিত হাদীসটিতে ইয়েমেনের যে অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে সেটা হলো দক্ষিন ইয়েমেনের আদনে আবইয়ান অঞ্চল। আর এটিই ছিলো আরবের একমাত্র পরিপূর্ণ কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র। হাদীসে বর্ণিত এসব অঞ্চলগুলোর অবস্থার কথা ভেবে এই সেদিনও আমি ভাবতাম,বিজয় বহু দূরে এবং আমার জীবনে তা দেখে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই।
সুবহানাল্লাহ! মাত্র বিশ বছরের ব্যবধানে কি আশ্চর্যজনক পরিবর্তনই না সাধিত হয়েছে এসব অঞ্চলে। কতো দ্রুত আমরা কতো পরিবর্তিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি।

প্রথম জিহাদ শুরু হয় ফিলিস্তিনে। আসলে উম্মতের এই পুনরুত্থানের যুগে ফিলিস্তিনই প্রথম শাহাদাতের গুরুত্বকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। আজকাল ফিলিস্তিনে শাহাদাত একটি সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং সাধারণ জনগন শাহাদাতকে বিবাহ অনুষ্ঠানের চাইতেও উত্তমভাবে উদযাপন করে। এখন সেখানে কোনো যুবক যখন আল্লাহর পথে জীবন উতসর্গ করে ,তখন তাঁর পরিবারের লোকেরা একটি তাবু টানায় এবং অন্যান্য লোকেরা এসে সেই পরিবারকে সাদর সম্ভাষণ জানায়। যেনো তাঁদের সন্তান নতুন বিবাহ করেছে। যে এলাকায় লোকেরা ছিলো আল্লাহর দ্বীন থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে তারাই আজ দ্বীনের সর্বোচ্চ আমল শাহাদাতকে পুনরুজ্জীবিত করেছে এবং এই আমলকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আফগানিস্তান,যেটি এই সেদিনও ছিলো একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র,সেই দেশটিই কি না হয়ে উঠলো জিহাদের মারকায। আমার মনে হয় দুনিয়াতে বর্তমানে যতো স্থানে জিহাদ চলছে,আফগানিস্তানের সাথে তার কোনো না কোনো যোগসূত্র অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে। এক কথায় বলা যায় আফগানিস্তান হলো বর্তমান যামানার মহান জিহাদী আমলের সূতিকাগার। চিন্তা করে দেখুন তো একটি কমিউনিষ্ট দেশ,যা গোটা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে শিক্ষার হারের দিক থেকে সব চেয়ে নিম্নস্তরে। যে লোকেরা ইসলাম সম্পর্কে তেমন গভীর জ্ঞান রাখতো না,তারাই আর্বিভূত হলো গোটা মুসলিম উম্মাহার কান্ডারী হিসেবে। তারা কোনো তথাকথিত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ ও বিখ্যাত আলেম উলামাও নন,যাদেরকে হর হামেশা স্যাটেলাইট টেলিভিশনে দেখা যায়। অথচ তারাই এই বিংশ শতাব্দীতে হারিয়ে যাওয়া সুন্নাহ জিহাদকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। তাদের মাধ্যমেই জিহাদের পথে মানুষের পুণর্জাগরণ হয়েছে। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. এর মতো মহান মুজাহিদদের ইলম আফগানিস্তান থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইরাকের কথাটি একটু ভেবে দেখুন। এই কয়েক বছর পূর্বেও কি কেউ ভাবতে পেরেছে যে,ইরাক জিহাদী আমলের ক্ষেত্রে পরিণত হবে? কে ভাবতে পারতো যে,সাদ্দামের মতো নাস্তিকের দেশটি জিহাদের পূণ্যভূমিতে পরিণত হবে? এমনকি এটা আমেরিকানরাও ভাবতে পারে নি। তারা ভেবেছিলো যে বাগদাদে তাদেরকে লাল গালিচা সংবর্ধনা দেয়া হবে। তাদের পথে ফুল বিছিয়ে তাদেরকে স্বাগতম জানানো হবে।

সুবহানাল্লাহ! অথচ এই ইরাক এখন মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের ময়দানে পরিনত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরাকের ভূমিকে পৃথিবীর ভবিষ্যত পট পরিবর্তনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে প্রস্তুত করছেন। বারো বছরের অবরোধ এবং প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ ছাড়া ইরাকী জনগনও মুজাহিদ রূপে আর্বিভূত হতো না এবং ইরাকও একবিংশ শতাব্দীর মুজাহিদদের যুদ্ধ ফ্রন্ট হিসেবে প্রস্তুত হতো না। আল্লাহ তাআলা ইরাকী জনগনকে প্রস্তুত করার জন্য একাধিক বুয়াস সংগঠিত করেছেন। কেননা,সাদ্দাম হোসেনের বর্তমানে এমন পরিবর্তন সম্ভব ছিলো না। তাই

আল্লাহ তাআলা আগে তাকে নির্মূল করেছেন-তারই এককালীন বন্ধুদের দ্বারা। ইরাককে নেতৃত্ব শূণ্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমেরিকানদেরকে দিয়ে এই কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা এসেছে সাদ্দামকে উতখাত করতে,অথচ বুঝতেই পারেনি যে এই ফাঁদে পা দিয়ে তারা কোনো মৃত্যুকূপে চলে এসেছে। তারা সাদ্দামকে উতখাত করেছে আর আল্লাহ তাআলা আমেরিকার আতঙ্ক আবূ মুসআব আয যারকাবী রহ.কে নেতৃত্বে নিয়ে এসেছেন। এভাবে আমেরিকানরা তাদেরকে আরো ভয়ংকর সমস্যার মধ্যে নিমজ্জিত করেছে। আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন যে,হয়তো এই হাটু পানিতে ডুবেই আমেরিকার সলীল সমাধি হবে ।

দক্ষিন ইয়েমেনে,যেটি ছিলো আরবের কমিউনিষ্ট এলাকা। সেটিই এখন ইসলামের পূর্ণজাগরনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। যে অঞ্চলটি এই পূর্ণজাগরনের কেন্দ্র সেটি হলো আদনে আবইয়ান অঞ্চল। এটিই সেই বিশেষ এলাকা,যার কথা আল্লাহর রাসুল সা. তাঁর ভবিষ্যতদ্বানী সম্বলিত হাদীস সমূহে উল্লেখ করেছেন।

আমরা যদি একটু মনোযোগের সাথে লক্ষ্য করি,তাহলে দেখতে পাবো যে,বিগত বিশ বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে এই এলাকাসমূহে অবস্থার কি আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এসব ঘটনাপ্রবাহ কি আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় না যে,উম্মাহর বিজয় অতি সন্নিকটে?
অবস্থার এই পরিবর্তন কি প্রমাণ করে না যে আল্লাহর রাসূল সা. যেসব অঞ্চলের উপর গুরুত্ব আরাপ করেছেন সেসব অঞ্চলগুলোকে আল্লাহ তাআলা সমাগত ভবিষ্যত পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত করেছেন?
ইরাক,খোরাসান,শাম এবং ইয়েমেনকে আল্লাহ প্রস্তুত করেছেন পরবর্তী অবস্থার জন্য। আর পরবর্তী অবস্থা কি?
সেই পরবর্তী অবস্থা হলো আল মালহামা (অর্থ্যাত ঈসা আ. ও দাজ্জালের মধ্যে সংঘটিতব্য যুদ্ধ যে যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হবে) কারন রাসূল সা. এই সকল অঞ্চলের আলোচনা এনেছেন ইমাম মাহদী ও মালহামা প্রসঙ্গে।

আল মালহামা হলো সেই মহাযুদ্ধ,যা সংগঠিত হবে মুসলিম জাতি ও রোমানদের তথা পশ্চিমাদের মধ্যে এবং এর পরই মুসলমানরা বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ ব্যবস্থা কায়েমে সক্ষম হবে।

কারণ আমাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্তিতি বুঝতে হবে। এখন আর নিছক আঞ্চলিক বলতে তেমন কিছু নেই। আমরা এখন গ্লোবাল ভিলেজ বা বৈশ্বিক গ্রামে বসবাস করছি। এখানে আর আংশিক বিজয়ের কোন সুযোগ নেই। বিজয় হলে বিশ্বব্যাপী বিজয় আর হারলে বিশ্বব্যাপী হার। অবস্থা এখন আর এমন নেই যে,আপনি ছোট্ট কোন একটি এলাকা জয় করে সেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করে নিরাপদ থাকবেন। না কিছুতেই এখন এটা আর সম্ভব নয়। বিশ্ব তাগুত আমেরিকা ও তার দোসরদের ঔদ্বত্য ও জুলুম নির্যাতন এমন একটা প্রকট আকার ধারন করেছে যে,আপনি যেখানেই থাকুন না কেন,তারা খুঁজে বের করে আপনাকে নির্মূল করে দেয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। মানুষেরা মহাকাশ বিদ্যা ও আকাশ পথে আক্রমনের ব্যাপক ক্ষমতা অর্জনের পূর্বের পরিস্থিতি ছিলো ভিন্ন রকমের। তখন একটি পাহাড় দখল করে দূর্গ নির্মাণ করে যুগের পর যুগ নিরাপদে কাটিয়ে যেতো। কিন্তু এখন এরকম হলে তারা বি ৫২ বিমান পাঠিয়ে আপনাকে আপনার দুর্গসহ নির্মুল করে দিতে মোটেও বিলম্ব করবে না।

ভবিষ্যত যুদ্ধে হয় সামগ্রিক বিজয় অর্জন করতে হবে অথবা সামগ্রিক পরাজয় বর্জন করতে হবে। আর এটাই হলো মালহামার অংশ। এটাই হবে ঈমান ও কুফরের মধ্যকার চূড়ান্ত যুদ্ধ। এটাই সেই যুদ্ধ যা এই উম্মাহকে বিজয় দান করবে। তবে এখানেই শেষ নয় কারন এখনো দাজ্জাল রয়ে গেছে। আরো আছে ইয়াজুজ মাজুজ। কিন্তু এটাই হলো সেই যুদ্ধ যার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খিলাফাহ প্রতিষ্ঠিত হবে।

অতএব এটা হলো এমন ইঙ্গিত যা প্রমান করে যে আমরা সেই সময়ের একান্ত নিকটে এসে পড়েছি। আর সওয়াব অর্জনের এই সোনালী সময়ে দর্শক সারিতে দাঁড়িয়ে থেকে আমরা যদি অসাধারণ সওয়াব অর্জনের এই সুযোগকে হেলায় হারাই ,তাহলে আমাদের মতো নির্বোধ আর কাকে বলা যাবে?

এটা আসলেই সোনালী সময় । হাদীস থেকে এই সময়ের পুরস্কারের কথা জেনে সাহাবা ও সালফে সালেহীনরাও সেসময়ে উপস্থিত থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। সাহাবায়ে কিরামগন এই সময়ের সওয়াবের বর্ননা শুনে আকাংখা প্রকাশ করতেন যে আহ! আমরা যদি ঐ সমেয় বেচে থাকতাম! উদাহরন স্বরূপ হযরত আবু হুরায়রা বলেন: রাসুল সা. আল হিন্দ জয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পেতাম,আমার জান ও মাল উতসর্গ করতাম। শহীদ হলে শ্রেষ্ঠ শহীদদের একজন হতাম আর যুদ্ধ শেষে জীবিত অবসস্থায় ফিরে এলে আমি হতাম মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা। আহমাদ,আন নাসাঈ,আল হাকীম।

আমরা হতভাগারা এই সোনালী সুবর্ণ সময়ে বসবাস করা সত্ত্বেও নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করছি। এজন্য শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. বলতেন,জিহাদ একটি মার্কেটের মত। এটা যখন খোলা হয়,তখনই কেনা বেচা করে ব্যবসা করে নিতে হয়। মার্কেট যখন বন্ধ হয়ে যায়,তখন হা হুতাশ করে কোন লাভ নেই। যখন মার্কেট খোলা থাকে তখন যদি তোমরা পেছনে পড়ে থাকো,ইতস্তত: করো ,অনাগ্রহ প্রকাশ করো,তাহলে তোমরা একটি সুবর্ণ সুযোগ হারাবে। যা তোমাদের জীবনে আর ফিরে নাও আসতে পারে।

তবে মনে রাখতে হবে এটা যেহেতু জিহাদের সোনালী সময়ত,সেহেতু এর সওয়াব ও পরিশ্রম ও ত্যাগ তিতিক্ষা ছাড়া এমনিতেই পাওয়া যাবে না।কারন একাজের বিনিময় যেমন সবচেয়ে বড়,তেমনি এ কাজ যে ত্যাগ দাবী করে সে ত্যাগও নিশ্চয়ই সবচেয়ে বড় হবে। এ কারনে যেন তেন লোকেরা এই ত্যাগ স্বীকারও করতে পারবে না এবং এই বিনিময়ও অর্জন করতে পারবে না। উত্তম ঈমানদারদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম,আল্লাহ সুবনাহু তাআলা যাদেরকে পছন্দ করবেন তারাই কেবল এই ত্যাগ স্বীকার করতে পারে এবং তারাই কেবল এই মর্যাদা অর্জন করতে পারবে।

উম্মাহার বর্তমান দূরাবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়

আমরা সকলে একথা একবাক্যে স্বীকার করি যে,আমরা অনেক সমস্যায় আছি। আমরা গোটা মুসলিম উম্মাহ ভয়াবহ সমস্যা ও মারাত্মক খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে সময় পার করছে। কিন্তু যখনই আমরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ সম্পর্কে আলোচনা করতে বসি,তখনই আমরা একেকজন একেক ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করে াকি। একেকজন একেক মত পেশ করে থাকি। কিন্তু আমরা সকলে যদি কুরআন ও সুন্নাহ মেনে নিতে সম্মত হই,তাহলে আমাদের এই মতের ও পথের কোনো পার্থক্য থাকার কথা নয়।আমরা সকলে আমাদের প্রশ্নের জবাব যদি কুরআন ও সুন্নাহ থকে গ্রহন করতে সম্মত হই,তাহলে আর মতপার্থক্যের কোনো সুযোগ থাকে না।তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই আমাদের এই দূরাবসস্থা থেকে উত্তরণের জন্য রাসূল সা. কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

আমাদের এই দূরাবস্থায় পতিত হওয়ার কারন এবং তা থেকে উত্তরণের উপায় প্রসঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.এর বর্ণনা রাসূল সা. বলেন,

অর্থ:যখন তোমরা কেবল ব্যবসা বানিজ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে,গরুর লেজের (দুনিয়ার) পিছনে ছুটবে,ক্ষেত খামারী কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর লাঞ্চনা চাপিয়ে দিবেন।আর ততক্ষন তিনি এই লাঞ্চনা তুলে নিবেন না,যতক্ষন পর্যন্ত না তোমরা তোমরা তোমাদের আসল দ্বীনের (জিহাদের) প্রতি ফিরে আসবে।

আল্লাহর রাসূল সা. এই হাদীসটিতে আমাদেরকে সমস্যা,সমস্যায় পতিত হওয়ার কারন ও তা থেকে উত্তরণের উপায় সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন্। আজকাল আমাদের এই সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে বসলে একেকজন একেক বিষয়কে সমস্যা হিসেবে তুলে ধরেন এবং নিজেদের মনগড়া সমাধান দিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তারা রাসূল সা. এর কাছ থেকে এই দূরাবস্থার কারণ ও তার সমাধান জানতে আগ্রহী তাদের জন্য এই একটি হাদীসই যথেষ্ট।

আল্লাহর রাসূল সা. দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন,আমরা যখন ব্যবসা বাণিজ্য ,ক্ষেত খামার,গরু বাছুর তথা দুনিয়া কামাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বো এবং আল্লাহর পথে

জিহাদ করা ছেড়ে দিব,তখন আমাদের কপালে অপমান,অপদস্ত,লাঞ্চনা,গঞ্জনা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই জুটবে না।
আজকাল তথাকথিত মুসলমানদের অনেককে বলতে শোনা যায় যে,মুসলমানদের এই দূরাবস্থার কারন কারন হলো মুসলমানরা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান,তথ্যপ্রযুক্তি,জ্ঞান গবেষণা,উৎপাদন ও শিল্প কারখানা ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করতে পারত,তাহলে মুসলমানরা অনেক উন্নত জাতিতে পরিণত হত।

অনেককে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শোনা যায় মুসলমানরা যদি (কাফিরদের ভাষায়) সন্ত্রাসবাদ/জঙ্গিবাদ (ইসলামের ভাষায় জিহাদ) থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতো এবং নিজেদেরকে ব্যবসা বানিজ্য ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নে নিয়োজিত করতো তাহলে সারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দিতে পারত।অথচ স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সা. এর বক্তব্য মতে এটি সম্পূর্ণ একটি ভূল,মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য। শুধু তাই নয় বরং আমরা যদি এমনটি করি তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। তিনি উল্লেখিত হাদীসে সমাধান বলেছেন আসল দ্বীনে ফিরে যাওয়া। হাদীস বিশারদগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন এখানে আসল দ্বীনে ফেরত আসার অর্থ হল জিহাদের পথে ফিরে আসা। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দেয়ার নাম হল আল্লাহর দ্বীনকে পরিত্যাগ করা। জিহাদ মানে দ্বীন আর দ্বীন মানে জিহাদ।অতএব আমাদের এই অবস্থার একমাত্র সমাধান হল জিহাদের পথে ফিরে আসা।
ইবনে রজব আলী হাম্বলী রহ. বর্ণনা করেন যে সালাফদের কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি তো নিজ পরিবারের জন্য একটি খামার বানাতে পারেন,কিন্তু বানাচ্ছেন না কেন?
তিনি বললেন,দেখ আল্লাহ সুবনাহু তাআলা আমাকে খামার বানাতে পাঠান নি। বরং খামারীদেরকে হত্যা করে খামার ছিনিয়ে নিতে পাঠিয়েছেন।

একারণেই হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. যখন শুনলেন যে জর্ডানের উর্বর ভূমি বিজয়ের পর সাহাবাায়ে কিরামগণের কেউ কেউ জিহাদ ছেড়ে দিয়ে জমি চাষাবাদে লেগে গেছে তখন তিনি মারাত্মকভাবে লেগে গেলেন এবং অপেক্ষা করতে লাগলেন

কখন ফসল পাকে। তারপর যখন সে জমির ফসল পেকে আসলো তখন তিনি তা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন।

সাহাবায়ে কিরামদের কেউ কেউ যখন তার কাছে অভিযোগের সুরে কথা বলছিল তখন তিনি বললেন,দেখ জমি চাষাবাদ করা ইহুদি নাসারাদের কাজ। তোমাদের কাজ হল আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করা।তোমরা এই চাষাবাদের দায়িত্ব ইহুদি নাসারাদের উপর ছেড়ে দাও।তোমরা আল্লাহর দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে বেড়িয়ে পড়। তারাই চাষাবাদ করে তোমাদেরকে খাওয়াবে।তারা জিজিয়া দিবে। তারা খেরাজ দিবে। সেগুলো তোমরা খাবে। তোমরা কি দেখ না যে তোমাদের নবী সা. বলেছেন,
অর্থ: আমার রিজিক আমার তলোয়ারের ছায়াতলে। আর যারা আমার বিরোধিতা করবে,তাদের ভাগ্যে অপমান ও লাঞ্ছনা অবধারিত।

অতএব রাসুল সা. এর রিজিক যদি গণীমতের মাধ্যমে আসে তাহলে নিশ্চয়ই গণীমতের মাধ্যমে আসা রিজিক সর্বোত্তম রিজিক। অবশ্যই তা ব্যবসা বাণিজ্য,চাষাবাদ,গবাদি পশু পালন ইত্যাদির দ্বারা উপার্জিত রিজিকের চেয়ে অনেক উত্তম।
কিছুদিন আগে ইরাকে যুদ্ধরত একজন মহান মুজাহিদের একটি ইন্টারভিউ নেয়া হয়েছিল।তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনাদের অর্থনৈতিক উৎস কি? তিনি বলেছিলেন,আমাদের অর্থনৈতিক উৎস গণীমত। তবে মুসলমানরা যদি আমাদের কোন সহযোগিতা করে তাহলে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করে থাকি। তারা মানুষের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করবে না । তারা গণীমত দিয়ে তাদের জিহাদের অর্থের প্রয়োজন পূরণ করবে।

অতএব সবশেষে আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে উম্মতের যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান হল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। উম্মাহ যখন এই একটি আমলের উপর উঠে আসবে,এই ইবাতাতটি যখন সঠিকভাবে আরম্ভ করবে ,যখন এই পথে উম্মাহ অটল অবিচল দাড়িয়ে যাবে তখন তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

লোকেরা জিহাদকে ভয় পায়,কারন তারা মনে করে জিহাদ করতে গেলে জান মাল খোয়াতে হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে বাস্তবতা হল ,উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদরত থাকে তখন উম্মাহ সম্পদশালী হয় এবং তারা সবচেয়ে কম সংখ্যক নিহত হয়।

আমরা যদি উম্মহার মৃত্যুর আনুপাতিক হার দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন তাদের নিহতের আনুপাতিক হার ছিল খুবই কম। অথচ তারা যখন জিহাদ ছেড়ে দিয়েছে তখন উম্মতের মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ কুফফারদের হাতে নিহত হয়েছে। যদি অর্থনৈতিক অবস্থার উপর জরিপ চালাই তাহলে দেখতে পাই যে,উম্মাহ যখন আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তখন উম্মাহ সবচেয়ে সম্পদশালী হয়েছে। আর যখন উম্মাহ আল্লাহর পথে জিহাদ করা ছেড়ে দিয়েছে,তখন তারা সবচেয়ে দারিদ্র জাতিতে পরিণত হয়েছে।

ইসলামিক রাষ্ট্রের মত এমন জনকল্যানমূলক রাষ্ট্র ইতিহাসে দ্বিতীয়টি কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্র কখনো তার মুসলিম জনগনের উপর কোনো ট্যাক্স আরোপ করেনি। কীভাবে তারা কোন রকম ট্যাক্স ছাড়া রাষ্ট্র পরিচালনা করে ? কারন যাকাত ছাড়াও এই রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধানতম উতস ছিল জিযিয়া,খেরাজ,গণীমত এবং ফাঈ। আর এই সকল উপার্জনের মূল উতস হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। আর বর্তমান মুসলিম উম্মাহ জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ছেড়ে দিয়েছে এবং এর পরিণামে তারা তাদের জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়েছে। অথচ ইসলামী শরীয়াতে সকল প্রকার ট্যাক্স হারাম এবং ট্যাক্স সংশ্লিষ্ট কোনো কাজে যারা নিয়োজিত থাকে তারা প্রত্যেকে অভিশপ্ত।

(ইসলামের দৃষ্টিতে ট্যাক্সের মাধ্যমে জনগনের সম্পদ লুণ্ঠন এতই জঘন্যতম নিকৃষ্ট কাজ যে রাসুল সা. একে ব্যাভিচারের চেয়েও জঘন্য আখ্যা দিয়েছেন। রাসুল সা. এর জীবদ্দশায় এক মহিলা ব্যভিচার করার পর এতই অনুতপ্ত হন যে তিনি আল্লাহর রাসুলের কাছে এসে তার গুনাহের কথা স্বীকার করেন যাতে তার উপর আল্লাাহর বিধান (প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা) কায়েম করা হয় এবং আল্লাহ তাআলা আখিরাতে তাকে মাফ করে দেন। এই মহিলার ব্যাপারে রাসুল সা. বলেন,সে এমন তওবা

করেছে যে,অন্যায়ভাবে ট্যাক্স আদায়কারীও যদি এভাবে তওবা করতো,তাহলে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও মাফ করে দিতেন।(মুসলিম ,হাদীস নং ৩২০৮) সহীহ মুসলিমের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,আল্লাহর রাসুলের এ বক্তব্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ট্যাক্স (আরোপ ও আাদায়) এমন একটি জঘন্যতাম কবীরা গুনাহ ,যা মানুষকে অবধারিতভাবে জাহান্নামী করে দেয়)

এটাই হল মুসলিম উম্মাহর যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। আমাদের শুধু উপরোক্ত হাদীসটির মর্ম ভালভাবে উপলব্ধি করা উচিত এবং এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা উচিত।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

****